Registered

মূল্য ঃ দুই টাকা

এক

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পরিচিত বিপ্লবী সূত্রগুলোকে অর্থহীন জপমন্ত্রের মত মুখস্থ করে আউড়ে চলা এবং প্রতিপদে বাস্তব পরিবেশকে অগ্রাহ্য করে বৈপ্লবিক সংগ্রামের নামে অতি বামপন্থার দিকে গিয়ে আন্দোলনকে বানচাল করে দেওয়ার যে প্রবণতা তারই নাম ডগ্‌মাটিজম-সেক্‌টারিয়ানিজম।

—ত্রিদিব চৌধুরী

গণবার্তা

সূচি..... পৃষ্ঠা

স্বপ্নের ব্রিগেড সমাবেশ ১
দেশে-বিদেশে ২
কেমন আছেন প্রতিবেশি ৩
দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদ ৪
বিহার নির্বাচন ও পশ্চিমবঙ্গ ৫
পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান সম্প্রদায়কে 'অপর' চিহ্নিতকরণ ৬
মার্কিন-ইরান পারমাণবিক চুক্তি ৭
প্রবীর সেনগুপ্তের স্মরণসভা ৮

68th Year 28th Issue ★ Kolkata ★ Weekly GANAVARTA ★ Saturday 6th Mar 2021

স্বপ্নের ব্রিগেড মহাসমাবেশ ইতিহাস রচনা করেছে মানুষের সংগঠিত এবং স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ উদ্বেল করেছে

২৮ ফেব্রুয়ারি রবিবার কলকাতার বহু লক্ষ মানুষতো বটেই, সারা রাজ্যের কোটি কোটি মানুষ সোল্লাসে প্রত্যক্ষ করলো এক অভূতপূর্ব এবং অশ্রুতপূর্ব সুবিপুল রাজনৈতিক সমাবেশ। কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের মতো এক বিশাল উন্মুক্ত চত্বর অতি ক্ষুদ্র বলে বোধ হল। যে লক্ষ লক্ষ মানুষ নিজেদের উপার্জিত অর্থে ও সামর্থে দু'দিন আগে থেকেই ব্রিগেডে পৌঁছেছিলেন তাঁদের সকলের স্থান সংকুলান হয়নি মূল মাঠে। বহু সহস্র বা অগুণতি মানুষ ফোর্ট উইলিয়াম বা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছে বসেছিলেন ঠায় চার পাঁচ ঘণ্টা। উপচে পড়া ব্রিগেড ময়দানে সকলের স্থান সংকুলান না হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। এই প্রসঙ্গটি অভিনব বা অত্যাশ্চর্য হলেও সত্যি।

রাজ্য বামফ্রন্ট নেতৃত্ব পূর্বানুমান করেছিলেন যে, রাজ্যের সর্বত্র মানুষের মধ্যে যে উন্মাদনা সৃষ্টি হয়েছিল তা অবশ্যই এক ঐতিহাসিক জনসমাবেশের ইঙ্গিত বহন করছিল। তা হলেও, বাস্তবে যে এত বিপুল সংখ্যক মানুষ ২৮ ফেব্রুয়ারি কলকাতার ব্রিগেড সমাবেশকে এভাবে সফল করে তুলবেন তা, সম্ভবত সঠিক আঁচ করতে পারা যায় নি। সমাবেশের সংখ্যা এবং গুণমান বস্তুত অতীতের সমস্ত রেকর্ড বা নজির অতিক্রম করে গেছে। এ যেন তুলনাহীন এক গণমিলনের স্থানে পরিণত প্রায় মহাসমুদ্র।

এবারের ব্রিগেড সমাবেশে যেমন কৃষক বা শ্রমজীবী অংশের অসংখ্য মানুষের উপস্থিতি নজর কাড়ার মতো ছিল তেমনই ছাত্র-যুব বয়সী উৎসাহী এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানুষের ভিড়েও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। বাঁধভাঙা বন্যার মতো মানুষ একান্তভাবেই দিন বদলের স্বপ্নপূরণে অধীর হয়ে নেতৃত্বের কথা শুনতে এসেছিলেন। ব্রিগেডের সমাবেশে নারী পুরুষ যেমন অংশগ্রহণ করেছেন তেমনভাবেই, তৃতীয় লিঙ্গের বহু মানুষও উপস্থিত। খঞ্জ মানুষ হুইল চেয়ার বন্দি হয়েও বহুদূর ক্লান্তিকর পথ অতিক্রম করে পৌঁছে গেছেন ব্রিগেড ময়দানে। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মহামিলন স্থলে পর্যবসিত কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড। তিল ধারণের স্থান পর্যন্ত পরিপূর্ণ। সেদিনের প্রখর রৌদ্রতাপ এবং গরম উপেক্ষা করেই লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রায় শেষ পর্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে বসে বা দাঁড়িয়ে থেকেছেন।

বামফ্রন্ট-জাতীয় কংগ্রেস এবং ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট (আই এস এফ) এর সম্মিলিত অংশগ্রহণে বা আহ্বানে এবারের ব্রিগেড মহাসমাবেশ। এই নতুন নির্বাচনী সমঝোতাকে সংযুক্ত মোর্চা হিসেবে সমাবেশস্থলে উল্লেখ করা হয়। দিল্লির কৃষক আন্দোলন সমগ্র দেশজুড়ে পরিব্যাপ্ত হয়েছে সংযুক্ত কৃষক মোর্চার নামে। পশ্চিমবঙ্গের নানা স্তরের দরিদ্র অংশভুক্ত মানুষের ঐক্য সম্ভব করতে এখন থেকে সংযুক্ত মোর্চা নিবিড়ভাবে যত্নশীল হবে বলেই নেতৃবৃন্দ মনে করেন।

২৮ ফেব্রুয়ারি ব্রিগেড ময়দানে সকাল থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলি একের পর এক সঙ্গীতানুষ্ঠান পরিবেশন করে। বেশ কয়েকজন চলচ্চিত্র জগতের নামী শিল্পীরাও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে অনুষ্ঠানে ছিলেন। তাঁরা অনেকেই তাঁদের বামপন্থী আদর্শের প্রতি বিশেষ ভালবাসা, প্রত্যয়ের কথাও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন। তাঁরা প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করেন যে বামপন্থা জীবনে চলার পথ নির্মাণ করে দেয়। শুধুমাত্র ভোট বিষয়েই তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। ভোটের ফলাফল নিরপেক্ষ ভাবেই বামপন্থী মতাদর্শে তাঁরা গভীরভাবে প্রত্যয়শীল।

২৮ ফেব্রুয়ারির অনন্য সমাবেশ বহু লক্ষ মানুষের সংগঠিত প্রয়াসের ফলেই সাফল্য পেয়েছে। সহজেই অনুমান করা সম্ভব যে, রাজ্যের পাহাড় থেকে সাগর পর্যন্ত অসংখ্য মানুষের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সাংগঠনিক উদ্যোগ ইতিহাস রচনা করেছে। কোন জাদুদণ্ড নয়, কোন ধর্মীয় উপাসনা নয়, মানুষ সম্মিলিত প্রতিবাদ প্রতিরোধে সামিল হতে সমবেত হন বিশেষ এক সময়ে। দেশকে বাঁচাতে, দেশের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব গভীর প্রশ্নের মুখে তা রুখে দিতে। এই বাস্তবতাকে অনেকটা হৃদয়ঙ্গম করে রাজ্যের সর্বত্র বামপন্থী নেতা কর্মীরা বেশ কিছুকাল যাবৎ নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রম, ঐকান্তিক বোধ এবং সাহসে নির্ভর করে চলেছেন। এদের সংগ্রামী ভূমিকাই ব্রিগেড ময়দানের সমাবেশকে ঐতিহাসিক স্তরে উন্নীত করেছে। নানা ধরনের বাধাবিপত্তি, হুমকি, জীবন সংশয় হতে পারে এমন ধমক উপেক্ষা করেই মানুষ এসেছিলেন ব্রিগেডে। তাঁদের প্রতি রাজ্যের বামপন্থী আন্দোলন অকুণ্ঠ সম্মান জানায়।

দুপুর একটার বেশ কিছু সময় আগেই বামপন্থী নেতৃবৃন্দ যথা, কম. বিমান বসু, কম. সীতারাম ইয়েচুরি, কম. ডি রাজা, কম. সূর্যকান্ত মিশ্র, কম. মনোজ ভট্টাচার্য প্রমুখ ব্রিগেডের সভাস্থলে পৌঁছে যান। জাতীয় কংগ্রেস নেতারাও অনেকে কিছুটা আগেই পৌঁছে যান সভাস্থলে। সভা শুরু হয় ঠিক দুপুর একটায়। কানায় কানায় পূর্ণ ব্রিগেড সোল্লাস শব্দে মুখরিত। নানা প্রান্তে সোচ্চার স্লোগান 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', 'মাফিয়া রাজের অবসান চাই', 'মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে', 'পেট্রোপণ্যসহ সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কমাতে হবে' প্রভৃতি। মোদী ও মমতার বিষাক্ত ঐক্য এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থ বরবাদ করার অপচেষ্টা সম্পর্কেও মানুষ তীব্র প্রতিবাদ মুখর।

এই ঐতিহাসিক সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন রাজ্য বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান কম. বিমান বসু। তিনি তাঁর প্রারম্ভিক সংক্ষিপ্ত ভাষণে জনগণকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন যে, এই সমাবেশ রাজ্য থেকে লুটপাট ও জাতপাতের ওপর নির্ভর সরকারকে হটিয়ে দিতেই মানুষের উদ্যোগে এই ঐতিহাসিক সমাবেশ। আমাদের উদ্দেশ্য বর্তমান সময়ে দেশের পক্ষে ভয়ঙ্কর বিপদ বিজেপি'র মতো একটি উগ্র সাম্প্রদায়িক অপশক্তি এবং তাদের দোসর পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেস দলকে জনবিচ্ছিন্ন করে বিকল্পের সন্ধান করা।

সমাবেশে প্রথম বক্তা ছিলেন সি পি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদের সম্পাদক কম. স্বপন ব্যানার্জী। তিনি রাজ্যের অরাজকতার বিস্তার ঘটানো তৃণমূল কংগ্রেস এবং সারা দেশে ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বংসকারী বিজেপি'র মতো দলকে পরাস্ত করা। বাম গণতান্ত্রিক শক্তির যৌথ উদ্যোগে গড়ে

এরপর ৪-এর পাতায়

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সাম্প্রতিক এক ভয়ঙ্কর নির্দেশ

যে কোনও সুস্থ নাগরিকের চিত্ত বিকল হওয়ার মতো এক ভয়ঙ্কর নির্দেশ জারি করা হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে। নির্দেশটি এই প্রকার ''দু'টি রাজ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় 'হিংসাত্মক' কথা কে বলছেন, কেই-বা 'অ্যান্টি ন্যাশনাল' মত প্রকাশ করছেন, পোস্ট দিচ্ছেন, তার জন্য তদারকি করতে বলা হল অন্যান্য নাগরিকদেরই। বলা হয়েছে, ভলান্টিয়াররাই যেন খোঁজখবর রাখেন এবং তেমন 'পোস্ট' দেখলেই যেন 'যথাক্ষেত্রে' জানিয়ে দেন। অর্থাৎ ভলান্টিয়ারই ঠিক করবেন, অ্যান্টিন্যাশনাল বক্তব্য কী ও কেন এবং তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করবেন।

বস্তুত, ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র হিসাবে যারা বিশ্ব ইতিহাসে পরিচিত, তারাই এমন দুষ্কর্মের দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন। নাগরিকদের বিরুদ্ধে নাগরিকদের হিংসায় প্ররোচনা দেবার এমন ফ্যাসিবাদী সুলভ দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন হিন্দুত্ববাদী নয়া ভারতবর্ষের শাসককুল। ধর্ম নিরপেক্ষ ও বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ ভারতে গণততন্ত্র 'হাইজ্যাক' হতে চলেছে। নতুবা ত্রিপুরা এবং জম্মু কাশ্মীর এমন নাগরিকত্বের একাংশের বিরুদ্ধে আর এক অংশকে প্ররোচিত করার ভয়ঙ্কর নির্দেশ জারি হতে পারত না। পাশাপাশি এমন লজ্জাজনক ঘটনার সঙ্গে তুলনীয় এদেশের সংগঠিত দুষ্কর্মে ভারতের সর্বোচ্চ আদালতের ভূমিকার কলঙ্কিত ইতিহাস উল্লেখ করতেই হয়। দূরদর্শনে প্রচারিত অযোধ্যার বাবরি মসজিদ ধ্বংসকাণ্ডের পরও সুপ্রিম কোর্ট ঘটনার জন্য দায়ী দুষ্কৃতীদের ২০ বছরের মধ্যেও সনাক্ত করতে ব্যর্থ হয় এবং কাউকেই ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত করা সম্ভব হয় নি। বাবরি মসজিদের ধ্বংসস্তুপের উপরই প্রস্তাবিদ রামমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের অনুষ্ঠানের স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীকে উপস্থিত থাকতেও দেখা গিয়েছে।

অবশ্য প্রায় একই রকম দুষ্কর্মের দু'দেশের ভিন্ন প্রতিক্রিয়া থেকে কোনও নির্দিষ্ট উপসংহার টানা সম্ভব বা সঠিক না হলেও, মৌলবাদের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের বিপরীতে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ভারতের বর্তমান অবস্থান যে কোনও সুস্থ চেতনাসম্পন্ন ভারতীয় নাগরিকের কাছে তীব্র বেদনাদায়ক বিষয়।

আশ্চর্যের বিষয়, সংখ্যালঘুদের পবিত্র স্থান বাবরি মসজিদের ধ্বংসস্তূপের রামমন্দির প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের অনুষ্ঠানে ধর্মনিরপেক্ষ ভারত রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতি দূরদর্শনে এবং সংবাদ মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হওয়া সত্ত্বেও জনমানসে তেমন তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায় নি। তাহলে কী এমন সিদ্ধান্তেই পৌঁছানো সঠিক হবে, মাত্র দু এক দশকের মধ্যেই পরধর্ম অসহিষ্ণু হিন্দুত্ববাদী দর্শন সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতীয়দের মধ্যে বেশ ভালভাবেই চারিয়ে গেছে এবং আমাদের গর্বের দেশটা এক অন্ধকার যুগে প্রবেশ করতে চলেছে।

নীতি আয়োগের বৈঠকে মোদী আরও সংস্কারের পক্ষেই সওয়াল করেছেন

নয়াদিল্লী, ২০ ফেব্রুয়ারি : কৃষি আইনের বিপক্ষে চলমান কৃষি আন্দোলনের মধ্যেই নীতি আয়োগের বৈঠকে আরও সংস্কারের পক্ষেই সওয়াল করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এদিকে এই আইন নিয়ে মোদী সরকারের সঙ্গে পঞ্জাব সরকারের বিরোধিতা চলছে। পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরেন্দ্র সিং-এর পরামর্শ ১৮ মাসের পরিবর্তে ২৪ মাস এই আইন স্থগিত রাখলে, আপাতত সমস্যা সমাধানের সূত্র পাওয়া যেতে পারে। অমরেন্দ্র সিং-এর আবেদন কেন্দ্রের অনমনীয় মনোভাবের ফলে সৃষ্ট সমস্যার সমাধান কেন্দ্রকেই করতে হবে। অবিলম্বে সমস্যার সমাধান না হলে পঞ্জাবের চাষ আবাদের যে বিপুল ক্ষতি হচ্ছে তার প্রভাব থেকে আগামী দিনগুলিতে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলগুলিও রক্ষা পাবে না।

এদিকে বিতর্কিত তিন কৃষি আইন নিয়ে কৃষক সংগঠনগুলির অভিযোগ, মোদী সরকার বড় বড় কর্পোরেট সংস্থাগুলিকে যত খুশি খাদ্য শস্য মজুত করার ক্ষমতা ছেড়ে দিচ্ছে এবং এই সংস্থাগুলি বিরাট মাপের হিমঘর গুদাম তৈরি করছে, যাতে ভবিষ্যতের মর্জিমাফিক ফসলের দাম ঠিক করা যেতে পারে। মোদীর বাহানা অবশ্য কৃষিপণ্য মজুদ ও প্রক্রিয়াকরণে সংস্কারের জন্যই নাকি এসব করা হচ্ছে।

অপবিজ্ঞান, কুসংস্কারের আবর্তে তলিয়ে যাচ্ছে একদা জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার পীঠস্থান ভারতবর্ষ। হিন্দুত্ববাদের কি অপার মহিমা!

দেশজুড়ে বিজ্ঞানচর্চা চুলোয় যাক, বৈজ্ঞানিক গবেষণাখাতে ব্যয় বরাদ্দ কমুক, হিন্দুত্ববাদী মোদী জমানায় গরু এখন মহামূল্যবান প্রাণী। অন্যতম প্রাচীন গৃহপালিত পশু হলেও (অবশ্য পশু না বলে 'মা' বলা সংগত)। গরুর যে এত গুণ, এত দিন অনাবিষ্কৃত ছিল তা এক আশ্চর্যজনক ঘটনা। গরুর দুধে সোনা পাওয়া যাচ্ছে, কেউ পরমাণু বিকিরণ প্রতিরোধে গোবরের সুপারিশও করছেন। আবার গো মাংস খেয়ে ধরা পড়লে পিটিয়ে খুনের মতো ঘটনাও ব্যতিক্রমী ঘটনা নয়, নয়া জমানায়। অতএব গরু নিয়ে চেতনা বাড়াতে, গরু নিয়ে আরও গবেষণার জন্য দেশের ৯০০টি বিশ্ববিদ্যালয়কে নির্দেশ দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন। যদিও আপাতত সেই সিদ্ধান্ত ইউ জি সি স্থগিত রেখেছে।

বস্তুত 'অ্যান্টি ন্যাশনাল' শব্দটির আইনগত ভিত্তি নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ না করেও বলা যায়, কেউ মূলস্রোতের জাতীয়তাবাদী ভাবনাচিন্তার সঙ্গে সহমত পোষণ না করলেই তাকে অ্যান্টি ন্যাশনাল বা বা জাতীয়তাবাদ বিরোধীর তকমা দেওয়াটা সঙ্গত কাজ হতে পারে না, নিঃসন্দেহে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের উপরোক্ত নির্দেশিকা কেবল নাগরিকত্বের বিরুদ্ধে নাগরিককে লেলিয়ে দেবার অস্ত্র মাত্র যা দেশের মানুষদের সমাজ বা রাজনৈতিক জীবনে এক অশনি সংকেত।

গত শতাব্দীতে দুনিয়ার মানুষ যে ফ্যাসিবাদকে দেখেছিল আজকের পরিস্থিতিতে তার রূপান্তর হতেই পারে, বর্তমান ভারতের ফ্যাসিবাদ রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে হিন্দুত্ববাদী এবং অর্থনীতিতে কর্পোরেট বান্ধব। কেন্দ্রে ক্ষমতাশীল গণশত্রুদের ক্ষমতা দখলের বিস্তার প্রতিরোধ করা না গেলে সংবিধান সংশোধন বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে চলমান কৃষক আন্দোলন কোনটাই সার্থক পরিণতি পাবে না। এবারের রাজ্যে নির্বাচন বা আগামী দিনে যে নির্বাচনগুলি অনুষ্ঠিত হবে সেগুলিকে এক শাসকের বিরুদ্ধে আর এক শাসকের নিছক ক্ষমতা দখলের লড়াই হিসাবে দেখলেই চলবে না। এই লড়াইকে ফ্যাসিবাদী শক্তির ক্ষমতা দখলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের লড়াই হিসাবেই দেখা প্রয়োজন এবং দেশের সব ফ্যাসিবাদ বিরোধী শক্তিগুলিকে এক ছাতার নীচে আনাটাই হবে মূল রাজনীতি।

সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে উত্তাল মায়ানমারের জনতা

২২ ফেব্রুয়ারি, মায়ানমার সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আহুত সাধারণ ধর্মঘটে দেশের প্রায় সর্বত্র জনজীবন প্রায় স্তব্ধ হয়ে পড়ে। দেশের সামরিক শাসকদের কোণঠাসা অবস্থা, ধর্মঘটের শেষে হিংসাত্মক ঘটনা এবং হুমকি উপেক্ষা করে বিপুল সংখ্যক জনতা রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। সামরিক শাসন জারি হওয়ার তিন সপ্তাহ পরও লাগাতার প্রতিবাদ আন্দোলন কমার কোনও লক্ষণ নেই। জনতার দাবি সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরে যেতে হবে, নির্বাচিত নেত্রী আউংসান সুকীকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। সামরিক শাসনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ আন্দোলন উত্তরের চিন সংলগ্ন সীমান্ত অঞ্চল থেকে শুরু করে, মধ্য মায়ানমারে সমতলভূমি ইরাবতী নদী উপত্যকা অঞ্চল দক্ষিণের সমুদ্র উপকূল অঞ্চল সর্বত্র ব্যাপকভাবেই ছড়িয়ে পড়েছে। সরকারি অফিসগুলিতে ব্যাপক গণঅনুপস্থিতিতে প্রশাসনিক কাজ প্রায় বন্ধ হতে চলেছে।

এদিকে মায়ানমারের সেনাকে ফের কঠোর বার্তা দিয়েছে রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব আন্তোনিয়ো গুতেরেস। রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার রক্ষা বিষয়ক সংগঠনের ৪৬তম বার্ষিক বক্তৃতায় গুতেরেস মায়ানমারের সামরিক শাসকদের সরাসরি কাঠগড়ায় তুলে বলেন অবিলম্বে তারা যেন দেশের নেতা ও নাগরিকদের উপর দমনমূলক নীতি প্রত্যাহার করে নেয়। মায়ানমারে সামরিক কর্তাদের অবৈধ ক্ষমতা দখল নিয়ে গোড়া থেকেই অসন্তোষ প্রকাশ করে আসছে রাষ্ট্রপুঞ্জ। পরিস্থিতি না পাল্টালে, আমেরিকা, ব্রিটেন, কানাডার পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞা চাপানোর হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

এদিকে নাগরিক বিক্ষোভ ঠেকাতে অনড় সেনাবাহিনী। ১ ফেব্রুয়ারি সেনা অভ্যুত্থান ও নেতানেত্রীদের গ্রেপ্তারের পর থেকে রোজই প্রতিবাদের মাত্রা বাড়ছে পাল্লা দিয়ে। সেনাদের অত্যাচারও বাড়ছে, বেড়েছে সেনাপুলিশের গুলিতে মৃত্যুর ঘটনা। রাস্তা ছাড়তে নারাজ সাধারণ মানুষও। সেনা হুমকি অগ্রাহ্য করে ইয়াঙ্গনে হাজার হাজার মানুষ প্রতিবাদ মিছিলে সামিল হয়েছেন।

প্রসঙ্গ : নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন

আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, কেরলে আসন্ন নির্বাচনের পাশাপাশি নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রসঙ্গটিও কিছুদিন স্তিমিত থাকার পর ফিরে এসেছে এবং রাজনৈতিক মেরুকরণের প্রক্রিয়াও তীব্রতর হচ্ছে। সম্প্রতি এক নির্বাচনী জনসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ঘোষণা করেছেন, কোভিড-১৯ টিকাকরণের কাজ শেষ হলেই কেন্দ্রীয় সরকার নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বাস্তবায়ন করবে। এদিকে মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন কেরলের নির্বাচনী সভাগুলিতে এই আইনের লাগাতার বিরোধিতা করে চলেছেন। আসামে নির্বাচনী জনসভাগুলিতে কংগ্রেসের রাহুল গান্ধিকেও সি এ এ-র তীব্র বিরোধিতা করতে শোনা গিয়েছে। নির্বাচনী রাজনীতির উত্তাপ ক্রমশ চড়তে থাকার সমান্তরালে বিতর্কিত আইনের বিরোধিতার মাত্রাও ক্রমশ বাড়তেই থাকবে বলেই মনে হয়। ২০১৯-এর ডিসেম্বরে সংসদে সি এ এ অনুমোদিত হওয়ার পর পাকিস্তান, আফগানিস্তান এবং বাংলাদেশ থেকে আগত অ-মুসলিমদের নাগরিকত্বদানের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কথা থাকলেও করোনা আবহে বিষয়টি ধামা চাপা ছিল। যাই হোক, সি এ এ অনুমোদিত হওয়ার পর ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থায় ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব দেওয়ার বিরুদ্ধে সারা দেশে বিশেষত, পশ্চিমবঙ্গ, আসামে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি এবং নাগরিক সমাজের এক বড় অংশ এই অনৈতিক আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে।

সিএএ-র বাস্তবায়ন নিয়ে হিন্দুত্ববাদী ভারতের বর্তমান শাসনকূলের এমন উদ্বেগ ও উদ্যোগের প্রাথমিক উদ্দেশ্য অজানা নয়। তবে এই আইনের বিরুদ্ধে মূল বিরোধী দলগুলির মধ্যেও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্ন ছাড়াও রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতাও আছে। আসলে দেশের বৃহত্তম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মুসলিমদের ভোটব্যাঙ্কের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। তাই আসন্ন নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে সি এ এ নিয়ে চাপান উতোর চলতে থাকবে এবং ধর্ম নিয়ে রাজনৈতিক তীব্র মেরুকরণের প্রক্রিয়া রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনকে আরও পঙ্কিল করে তুলবে। স্বাধীনতার পর এতগুলি বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের এমন পরিণতি সত্যিই বেদনাদায়ক। আর এস এস বা সংঘ পরিবারকে মুসোলিনী-হিটলারদের ভারতীয় সংস্করণ বললেও যারা 'বিজেপিকে ভোট নয়' বলে স্লোগান দিচ্ছেন তারাও কিন্তু ফ্যাসিবাদ বিরোধী ব্যাপকতম ঐক্য গড়ে তোলার বিষয়ে কোনও কথা বলছে না। নির্বাচনের মুখে 'No vote to BJP' এই নেতিবাচক স্লোগানে কতটুকু কাজ হবে তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে।

কেমন আছেন প্রতিবেশি

গৌতম রায়

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার আগে এই রাজ্যে সংখ্যালঘু উন্নয়ন বলে আদৌ কোনো দপ্তরই ছিল না। ক্ষমতা হস্তান্তরের চুক্তি (১৯৪৭) অনুযায়ী দেশের সংবিধানে সংখ্যালঘুর সার্বিক অধিকারের যে স্বীকৃতি আছে, তার প্রথম বাস্তব প্রতিফলন এই রাজ্যে হয় '৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর। দেশের ভিতর সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তর প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের আমলেই গঠিত হয়।

মাদ্রাসা শিক্ষার সার্বিক উন্নতি বামফ্রন্টের ধারাবাহিক কর্মকান্ডের ফসল। মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকীকরণ, বিশেষ মাদ্রাসা শিক্ষাকে মাধ্যমিক শিক্ষার সমতুল করা—সার্বিকভাবে বামফ্রন্ট সরকারের কৃতিত্ব। কেবলমাত্র জাতীয় স্তরেই নয়, আরব দেশগুলিতে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের আমলের মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকীকরণ, শিক্ষক, শিক্ষা সহায়ক কর্মীদের আর্থিক নিরাপত্তা, সবই ধাপে ধাপে বামফ্রন্টের আমলে হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের গত দশ বছরের শাসনকালে বামফ্রন্টের আমলের মাদ্রাসা শিক্ষা কমিশনকে অকেজো করা হয়েছে। কমিশনের পরীক্ষায় সফল হাজার হাজার ছেলেমেয়ের আজ পর্যন্ত নিয়োগ হয়নি।

মমতা ক্ষমতায় এসে দশ হাজার মাদ্রাসা তৈরির প্রতিশ্রুতি দিলেও আজ পর্যন্ত কেবলমাত্র ২৩৫টি আন-এইডেড মাদ্রাসা অনুমোদন পেয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার সময়ে (১৯৭৭) মাদ্রাসাগুলএ শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ছিল ২০১০ সালে তার সংখ্যা হয়েছিল ১৯৯৯২ জন। আর এখন অননুমোদিত যে সমস্ত আন-এইডেড মাদ্রাসা আছে, সেগুলির তালেবুর এলেমরা আজ পর্যন্ত সরকারী মিড ডে মিল পায় না। গরিব ছেলেমেয়েদের মুসলমান সমাজের ধনী মানুষদের জাকাত, ফেরেতের টাকাতেই পড়াশুনা করতে হয়। এইসব অননুমোদিত মাদ্রাসার তালবেলেমরা সমাজের শরিফ মানুষদের বদান্যতায় দুপুরে কিছু খেতে পায়। এইসব মাদ্রাসায় ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৪০০০০। সেখানে শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় ২৫০০। শিক্ষকরা সরকার থেকে কোনো সাহায্য পান না। এঁরা এইমুহূর্তে অনশনে বসেছেন। তাঁদের অনশন মঞ্চে যাতে কোনো ডেকরেটার ত্রিপল, মাইক ইত্যাদি না দেয় সে জন্যে মমতা ব্যানার্জীর প্রশাসন এবং তাঁর দল তৃণমূল কংগ্রেস সরাসরি হস্তক্ষেপ করছে। অথচ প্রবল শীতে অনশনরত মাদ্রাসার শিক্ষক, শিক্ষিকাদের জন্যে সামান্য শৌচালয় ব্যবহারের অনুমতি পর্যন্ত মমতার সরকার দেয় নি।

মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনকে অকেজো করে দিতে যিনি মাদ্রাসা পরিচালন সমিতির হয়ে মামলা লড়েছিলেন, সেই ব্যক্তিকে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের সদস্য করেছে তৃণমূলের সরকার।

মাদ্রাসার শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের জন্যে বেতন সহ মহার্ঘ্য ভাতার যে ব্যবস্থা বামফ্রন্ট করেছিল, দেশের ভিতরে মাদ্রাসা শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের জন্যে তেমন ব্যবস্থা বামফ্রন্ট সরকার প্রচলন করবার আগে ছিল না।

বামফ্রন্টের আমলে যে মাদ্রাসা বোর্ড তৈরি হয়েছিল, সেই বোর্ডটিকে গণতান্ত্রিক কাঠামোতে গত দশ বছরে প্রায় পরিচালিতই করে নি মমতার সরকার। বামফ্রন্টের আমলের সব কাজ কেবলমাত্র নামবদলে নিজেদের বলে চালিয়েছে। উদাহরণ, সপ্তম শ্রেণির দ্রুত পঠন, রোকেয়া জীবনী কেবলমাত্র লেখকের নাম না ছেপে পুনর্মুদ্রণ করে চলেছে মমতার সরকার।

বামফ্রন্টের আমলে মাদ্রাসার জন্যে যে বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠারে ব্যবস্থা ছিল, ধীরে ধীরে সেটিকে কার্যত অবলুপ্তির দিকে ঠেলে দিয়েছে তৃণমূলের সরকার।

বামফ্রন্ট সরকার '৭৮ সালে যে উর্দু আকাদেমি প্রতিষ্ঠা করেছিল, গত দশ বছরে তার কার্যকারিতাকে ধীরে ধীরে লুপ্ত করেছে মমতার সরকার।

পৃথক মাদ্রাসা শিক্ষক ডাইরেক্টরেট বামফ্রন্ট প্রতিষ্ঠা করলেও গত দশ বছরে এই বিভাগে নতুন নিয়োগ প্রায় হয়ই নি। ফলে কর্মী, পরিকাঠামো ইত্যাদির অভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে মাদ্রাসা ডাইরেক্টরেট কার্যত কোমায় চলে গেছে।

ভুলে গেলে চলবে না বামফ্রন্ট সরকার যখন আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় বিল আনে তখন সেই বিলের পক্ষে ভোট দেয় নি মমতার দল তৃণমূল কংগ্রেস। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর ভোকেশনাল স্টাডিজ সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের ভিতরে বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসারে যে ভূমিকা পালন করেছিল, সেই ভূমিকার একাংশও কেন গত দশ বছরে দেখতে পাওয়া গেল না?

পশ্চিমবঙ্গ ওয়াকফ বোর্ডকে সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি দিয়েছিল বামফ্রন্ট সরকার। সেই সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের অর্থ কি ভাবে ইমাম, মোয়াজ্জিনদের ভাতা হিসেবে দেওয়ার সিদ্ধান্ত সরকার নিতে পারে? ওয়াকফ বোর্ডের অর্থ খরচের অধিকার কি সরকারের আছে? সরকারের পক্ষ থেকে এই অর্থ খরচ কি সংবিধান মোতাবেক স্বীকৃত? একটি সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের স্বাধিকারের উপর রাজ্য সরকারের অবৈধ হস্তক্ষেপ হিসেবে কি তা বিবেচিত হবে না? এভাবে কি সংবিধান অবমাননা করে নি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসন? বামফ্রন্ট সরকার কিন্তু দুস্থ ইমাম, মোয়াজ্জিনদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাবাবদ বৃত্তি দিতো, সেটি সংখ্যালঘু মুসলমান সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের সহযোগিতা নিয়েই ওয়াকফ বোর্ডের মাধ্যম গত দশ বছরে ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের ভাতা দেওয়ার কথা সকলে শুনেছেন। কিন্তু তাঁদের সন্তানদের শিক্ষা প্রসারে বামফ্রন্ট সরকারের আমলের সেই বৃত্তির কি হল, তার খোঁজ কি একবারও হয়েছে? ওয়াকফ সম্পত্তি জরিপের যে কাজটি বামফ্রন্ট সরকারের আমলে শুরু হয়েছিল, তাকে কেন আর ত্বরান্বিত করলেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়? বামফ্রন্ট সরকার জেলাগুলিতে ১২টি ইংরেজি মাধ্যম মাদ্রাসার কাজ শুরু করেছিল তাঁদের শেষ পর্যায়ের শাসনকালে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় এসেই এই জেলাগুলির ইংরেজি মাধ্যম মাদ্রাসার কাজ বন্ধ করে দেন। যাঁরা প্রাথমিকে ইংরেজি ঘিরে বামফ্রন্ট সরকারকে দোষারোপ করতে অভ্যস্ত, তাঁরা কিন্তু সংখ্যালঘু মুসলমানদের ইংরেজি শেখার সুযোগ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক বন্ধ কর দেওয়া ঘিরে একদম নীরব।

আলু কৃষকদের অভাবী বিক্রি : স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ঘোষণা করতে হবে

একদিকে কেন্দ্রীয় সরকার কৃষি আইনের মাধ্যমে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে কৃষকের থেকে ফসল কেনার সরকারি ব্যবস্থাকে কার্যত লাটে তুলে দিতে চায়। অপরদিকে মুখে কেন্দ্রীয় আইনের বিরোধিতা করেও তৃণমূল সরকার কৃষকদের অভাবী বিক্রিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে সচেষ্ট। অন্যান্য মরশুমের মতো এবারেও ধানের অভাবী বিক্রি বন্ধ হয়নি। ঢাকঢোল পিটিয়ে ধান কৃষকের থেকে কেনার কথা বলা হলেও অধিকাংশ কৃষকই বিপুল পরিমাণ লোকসানের মুখে। আলু চাষের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। বাস্তবে সরকার ন্যূনতম সহায়ক মূল্য কমিয়ে কৃষককে অভাবী বিক্রিতে বাধ্য করছে।

এবারের লকডাউনের সুযোগে আলু বীজ নিয়ে ব্যাপক কালোবাজারি হয়েছে। রাজ্য সরকার কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করে নি। অতি ফলনশীলতার নামে বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ওষুধের ব্যবহার বহুগুণ বেড়েছে। গোটা ব্যবস্থাটাই কিছু বড় বড় কোম্পানির একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণে। চাষের খরচ বেড়ে চলেছে। এবারে গতবারের থেকে দ্বিগুণ দামে আলু বীজ কিনতে হয়েছে। বস্তা পিছু দাম ছিল সাড়ে চার হাজার থেকে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকার মধ্যে। সার, কীটনাশক সবেরই দাম বেড়েছে। বেড়েছে সেচের খরচ। অথচ, আলু বিক্রি করতে গিয়ে কৃষকরা দাম পাচ্ছেন না।

হুগলী জেলায় অন্যতম প্রধান ফসল আলু। আর এস পি'র পক্ষ থেকে জেলার বিভিন্ন ব্লকে এবারের মরশুমে আলু চাষের খরচ নিয়ে সমীক্ষা করা হয়েছিল। সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, জ্যোতি আলুর ক্ষেত্রে একর প্রতি জমিতে গড়ে বীজ আলু, সার, ওষুধ, সেচ, ট্রাক্টর ভাড়া প্রভৃতি নিয়ে মোট খরচ পড়েছে ৭৩ হাজার টাকা। যেসব কৃষক নিজেরাই শ্রম দেন কিংবা বাড়ির মহিলাদের শ্রমিকের কাজে লাগান, তাঁরা মজুরি বাবদ খরচ হিসেবে ধরেন না। সরকারও সেই হিসেব ধরে না। অথচ স্বামীনাথন কমিশন বলেছে যে শ্রমের মূল্য, জমির খাজনা ইত্যাদিকেও চাষের খরচের হিসেবে আনতে হবে। সে হিসেবে একর প্রতি কেজিতে আলু চাষে গড় খরচ হচ্ছে, ৯১ হাজার ৬০০ টাকা। একরে জ্যোতি আলুর ফলন হয়েছে একর প্রতি গড়ে ২০০ বস্তা বা ১০ হাজার কেজি। ৫০ কেজিতে এক বস্তা। অর্থাৎ খরচ পড়ছে কেজি প্রতি ৯ টাকা ১৬ পয়সা। ক্ষুদ্র চাষীদের ক্ষেত্রে কেজি প্রতি খরচ এর চেয়ে বেশি। ভাগচাষীদের ক্ষেত্রে এই খরচ আরও বেশি। কারণ একর প্রতি জমিতে তারা পাচ্ছেন গড়ে সাড়ে সাত হাজার কেজি (১৫০ বস্তা) আলু। অর্থাৎ খরচ পড়েছে কেজি প্রতি প্রায় ১২ টাকা ২২ পয়সা।

সমীক্ষায় দেখা গেছে পোখরাজ আলুর ক্ষেত্রে গড়ে বস্তা পিছু খরচ পড়েছে ৪৫৭ টাকা বা কেজি প্রতি ৯ টাকা ১৪ পয়সা। চন্দ্রমুখী আলুর ক্ষেত্রে বীজের দাম যেমন বেশি তেমন ফলন অপেক্ষাকৃত কম। তাই কেজি প্রতি খরচ জ্যোতির থেকেও বেশি। সব মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে, গড় খরচ কেজি প্রতি ১০ টাকার বেশি। স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ হল, খরচের দেড়গুণ অর্থাৎ এক্ষেত্রে কেজি প্রতি ১৬ টাকা ন্যূনতম সহায়ক মূল্য সরকারকে ঘোষণা করতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যে দু'বার নির্বাচনী প্রচারে হুগলী জেলা ঘুরে গেছেন। আলুর খাদ্যগুণ নিয়ে ভালো ভালো কথা শুনিয়েছেন। কিন্তু আলু চাষীদের জন্য সুখবর শোনাতে পারেন নি। গত ২৫ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের কৃষি দপ্তর আলু কেনার বিষয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে। হুগলী, পূর্ব বর্ধমান, বাঁকুড়া, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া ও উত্তর দিনাজপুর জেলায় হিমঘরগুলি ৬০০ টাকা কুইন্টাল (অর্থাৎ ৬ টাকা কেজি) ন্যূনতম দরে কৃষকের থেকে আলু নেবে। হিমঘরগুলিকে তার মজুত ক্ষমতার ১৫ শতাংশ কৃষকের থেকে আলু নিতে হবে।

সমীক্ষার হিসেব থেকেই পরিষ্কার ৬ টাকা কেজি দরে আলু বিক্রি করলে কৃষক বিশাল লোকসানের মুখে পড়বে। সরকারি দরই অভাবী বিক্রিতে কৃষককে বাধ্য করছে। হিমঘরে ফসল নিয়ে যাওয়ার খরচ ধরলে কৃষকের হাতে আরও কম অর্থ আসবে। কেবল ন্যূনতম সহায়ক মূল্যই খরচের থেকে কমানো হল না। সরকারও কৃষকের থেকে ফসল কেনার দায় স্বীকার না করে হিমঘর মালিকদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিল। যার অর্থ মজুতদারির সুযোগ করে দেওয়া। আসলে কৃষকের যত সর্বনাশ হবে, তত কোম্পানিগুলির পৌষমাস। তারা ত্রাতার বেশে চুক্তি চাষে কৃষকদের প্রলোভিত করবে। পরে কেবল কৃষি ব্যবস্থারই নয়, জমিরও দখল নেবে। মোদি সরকার তিনটি কৃষি আইনে সেই ব্যবস্থাই করেছে। তৃণমূল সরকারের ভূমিকাও এক।

অথচ সমবায় পদ্ধতিতে চাষ ও ফসল বিপণনের মাধ্যমে অভাবী বিক্রি বন্ধ করা যায়। আলু সহ বিভিন্ন দ্রব্যকে কেন্দ্র করে ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে উঠতে পারে। এতে যেমন কৃষক ফসলের ন্যায্য মূল্য পাবে, তেমনই গ্রামে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

হুগলী জেলার আলু চাষীদের এখন সাড়ে চার টাকা থেকে পাঁচ টাকা কেজি দরে আলু বিক্রি করতে হচ্ছে। অনেকেই আলু মাঠেই ফেলে রাখছেন। এই অবস্থায় স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ মেনে আলুর ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ঘোষণার দাবিতে আর এস পি হুগলী জেলায় প্রচার আন্দোলন শুরু করেছে। গত ২৫ ফেব্রুয়ারি আর এস পি হুগলী জেলা কমিটির পক্ষ থেকে জেলাশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। চাষের খরচের হিসেব উল্লেখ করে স্মারকলিপিতে দাবি জানানো হয়েছে যে, ১) স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ অনুসারে সরকারকে বস্তাপিছু ৮০০ টাকা অর্থাৎ ১৬ টাকা কেজি আলুর ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ঘোষণা করতে হবে। সরকারকে প্রতিটি পঞ্চায়েতে শিবির করে সরাসরি কৃষকের থেকে আলু কিনতে হবে। ২) হিমঘরে আলু সংগ্রহে কৃষককে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আগামীদিনে ব্লকগুলিতে সরকারকে হিমঘর নির্মাণ করতে হবে। ৩) সমবায় প্রথায় চাষ ও ফসল বিপণনের জন্য সরকারকে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। ৪) আলু সহ বিভিন্ন কৃষিজ পণ্যকে কেন্দ্র করে শ্রমনিবিড় ক্ষুদ্রশিল্প গড়ে তুলতে হবে।

আর এস পি হুগলী জেলা সম্পাদক কম. মৃন্ময় সেনগুপ্ত, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কম. কিশোর সিং ও কম. চম্পা বসাককে নিয়ে গঠিত প্রতিনিধিদল জেলাশাসককে এই স্মারকলিপি প্রদান করে।

স্বপ্নের ব্রিগেড মহাসমাবেশ ইতিহাস রচনা করেছে মানুষের সংগঠিত এবং স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ উদ্বেল করেছে

১-এর পাতার পর

ওঠা সংযুক্ত মোর্চাকে সর্বশক্তি দিয়ে আগামী নির্বাচনে জয়ী করার প্রয়াস নিতে হবে। বাংলার এই উদ্যোগ সারা দেশকে বিকল্পের সন্ধান দেবে।

পরবর্তীতে সারা ভারত ফরোয়ার্ড ব্লকের বাংলা কমিটির সম্পাদক কম. নরেন চ্যাটার্জী বলেন যে, দুনিয়ার সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশের মূল শক্তি অবশ্যই ধর্মনিরপেক্ষতা। বিজেপি দেশের গণতান্ত্রিক বোধকে আক্রমণ করে বিধ্বস্ত করে ফেলছে। এই অবস্থার প্রতিবিধান করতে বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তুলতেই হবে। দেশের সাধারণ মানুষ বাঁচতে চায়। সংযুক্ত মোর্চা সেই আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করতে সচেষ্ট থাকবে।

সি পি আই (এম)-এর সাধারণ সম্পাদক কম. সীতারাম ইয়েচুরি বলেন যে, সময় এসে গেছে যখন, লুটপাটের সরকার পরিবর্তন করে নতুন বিকল্প নীতিসম্পন্ন একটি ধর্মনিরপেক্ষ সরকার গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। তৃণমূল এবং বিজেপির মধ্যে বস্তুত কোনও পার্থক্যই নেই। বিজেপির সঙ্গে গভীর সমঝোতা করেই তৃণমূল কংগ্রেস দলটি পরিচালিত হয়। বেকারত্ব, দারিদ্র, ক্ষুধার অন্ন প্রভৃতির সংস্থান এই দুটি দলের দ্বারা কোনদিনই সম্ভব হবে না। রাজ্যের তৃণমূল সরকার বেকার যুবক-যুবতীদের কাজের দাবিতে মিছিলে নৃশংস আক্রমণ করে কম. মইদুল মিদ্যাকে হত্যা করেছে। এদের কাজ মানুষকে লুণ্ঠন করা। এর অবসান চাই। তিনি অসুস্থ শরীর নিয়েও এই মহাসমাবেশে উপস্থিত ছিলেন।

আর এস পি'র সাধারণ সম্পাদক মনোজ ভট্টাচার্য সমবেত জনগণকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানান। তিনি প্রথমেই উল্লেখ করেন যে, দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী উভয়েই ফ্যাসিবাদী পন্থায় তাঁদের অপশাসনের বিস্তার ঘটিয়ে চলেছেন। রাজ্যের উত্তরাংশে বিশেষ করে আদিবাসী দরিদ্র মানুষ অধ্যুষিত ডুয়ার্স -এ প্রায় দশটি চা বাগিচা বন্ধ। প্রায় পঁচিশ হাজার শ্রমিক কর্মহীন, উপার্জনহীন। তাঁর বুভুক্ষার মুখে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রায় উত্তরবঙ্গ ভ্রমণে যান। টিভি এবং সংবাদপত্রে তাঁর চলাফেরার সংবাদ বিশদে প্রচারিত হয়। কিন্তু, তিনি একবারের জন্য চা বাগিচর গরীব শ্রমজীবী মানুষদের দিকে ফিরেও তাকান না। এসব থেকেই তাঁর শ্রেণি চরিত্র পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়।

কম. মনোজ ভট্টাচার্য বলেন যে, সারা দেশে যেমন গণতন্ত্র ধ্বংস হয়ে চলেছে ২০১৪ সালের পর থেকে ঠিক তেমনই পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের অপশাসনে ২০১১ সাল থেকেই গণতান্ত্রিক ন্যূনতম বোধগুলি পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে চলেছে। এই দুই দল অর্থাৎ, বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে কোন ফারাক নেই। দেশে ভয়াবহভাবে উগ্র হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িকতার পরিকল্পিত বিস্তার ঘটে চলেছে। মানুষকে বিভাজিত করে সংকটগ্রস্ত আগ্রাসী পুঁজিবাদের স্বার্থ রক্ষা করতে বিজেপি সমস্ত শক্তি সংহত করে সাধারণ মানুষের স্বার্থ ধ্বংস করে চলেছে। বস্তুত পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্র দুই একসঙ্গে চলতে পারে না। পুঁজিবাদ এক নির্দিষ্ট সময়ে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করে।

কম. ভট্টাচার্য দিল্লিতে চলমান কৃষক আন্দোলনের প্রতি সমাবেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, মোদী সরকার একান্তভাবেই দেশ-বিদেশের কর্পোরেট কোম্পানিগুলির স্বার্থে কৃষক আইন লাগু করেছে। এদেশে আম্বানি আদানি প্রমুখ বিপুল সম্পত্তির অধিকারী ব্যবসায়ীদের মুনাফার স্বার্থ রক্ষা করাই মোদী-শাহ সরকারের লক্ষ্য। এই সরকার দেশের নিরানব্বই শতাংশ মানুষের বিরুদ্ধে মাত্র এক শতাংশ মানুষের স্বার্থ রক্ষার অপকর্মে ব্যস্ত। এমন সরকারের শাসনক্ষমতায় থাকার কোনও নৈতিক অধিকার নেই। দরিদ্র মানুষের ব্যাপক ঐক্য গড়েই এমন ভয়ঙ্কর শক্তির মোকাবিলা করা একান্ত জরুরি।

তৃণমূল কংগ্রেস সম্পর্কে মন্তব্য করে তিনি বলেন যে, এই দলটি ক্রমাগত খেলা মেলার নামে অজস্র অর্থ ব্যয় করতে উদ্ভট আচরণ করে চলেছে। মানুষের অধিকার কেড়ে নিয়ে তাদের কিছু ভিক্ষা দিয়ে জনমনোরঞ্জনের কুকর্ম করতে ব্যস্ত। সাধারণ মানুষের সম্মিলিত প্রয়াসে এমন সব চমক দেওয়া খেলা মেলা বন্ধ করে লড়াই চালাতে হবে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। সংযুক্ত মোর্চা সেই কর্তব্য পালনে বদ্ধপরিকর। তিনি বলেন রাজ্যের প্রায় সর্বত্র দেশেরও বহু স্থানে নারী সমাজ নিদারুণভাবে নির্যাতিতা হচ্ছেন।

কমরেড মনোজ ভট্টাচার্য পেট্রোল-ডিজেল-কেরোসিন তেল, রান্নার গ্যাস সহ সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম আকাশছোঁয়া। প্রতিদিন বেড়েই চলেছে। দেশের ভয়াবহ ও অভূতপূর্ব বেকারত্বের প্রসঙ্গ তুলে বলেন যে, কোটিকোটি বেকার যুবক-যুবতী সসম্মান জীবন দাবি করে। দেশের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব ধ্বংস করে মোদী সরকার একের পর এক রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প উদ্যোগগুলি জলের দলে বিক্রি করতে উন্মত্তের মতো অগ্রসর। দেশের জল জমি জঙ্গল বহুজাতিক ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দিচ্ছে। এর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে দীর্ঘস্থায়ী ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তুলতেই হবে। ধর্মের নামে বিভাজন নয়, ভাষার নামে হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্থান নির্মাণের গভীর অপচেষ্টাকে রুখতেই হবে। তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপিকে একযোগে প্রতিহত করতেই হবে।

সমাবেশে সি পি আই (এম)-এর রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র চলমান অবস্থাকে এক ভয়াবহ সর্বনাশ সংঘটিত করার অপকৌশল বলে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদী মানসিকতাকে বুথে বুথে নিয়ে যেতে হবে। আসন্ন নির্বাচনে সংযুক্ত মোর্চার নেতৃত্বে কঠিন লড়াই সংগ্রাম চালাতেই হবে।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী বলেন যে, ব্রিগেড সমাবেশের পর নিশ্চয়ই তৃণমূল আর বিজেপি'র দ্বিপাক্ষিক প্রতিযোগিতার গল্প শেষ হয়ে যাবে। তিনি সংযুক্ত মোর্চার ঐক্য আরও সুদৃঢ় এবং পরিব্যাপ্ত করার আহ্বান জানান।

সমাবেশে ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের নেতা আব্বাস সিদ্দকি দৃঢ়ভাবে সাধারণ দরিদ্র মানুষদের অধিকার আদায়ের লড়াই আরও তীব্রতর করার আহ্বান জানান। তিনি নির্দিষ্টভাবে বলেন যে, আই এস এফ-এর কর্মীরা প্রয়োজনে রক্ত দিয়েও বামপন্থী প্রার্থীদের পক্ষে দাঁড়াবে এবং তাঁদের জয় নিশ্চিত করার চেষ্টা করবে। তিনি আরও বলেন যে, তৃণমূল-বিজেপি'র অপশাসনে গরীব মানুষ তাঁদের অনেক গণতান্ত্রিক অধিকার হারিয়েছেন। সেগুলির পুনরুদ্ধার করবে সংযুক্ত মোর্চা। ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ রক্ষা করতে হবে।

সভায় উপস্থিত ছিলেন ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী জাতীয় কংগ্রেস নেতা ভূপেশ বাঘেল। তিনি তাঁর বক্তব্যে ছত্তিশগড়ের মতো একটি ক্ষুদ্র রাজ্যে দরিদ্র মানুষদের স্বার্থ রক্ষায় যেসব ভূমিকা রাজ্য সরকার নিয়েছে তা সবিস্তারে উল্লেখ করেন। মোদীর শাসনকালে দেশের গরীব মানুষ যে অভূতপূর্ব ক্ষতির মধ্যে পড়েছেন তার উল্লেখ করে লড়াই তীব্রতর করার আহ্বান জানান।

সমাবেশে সি পি আই-এর সাধারণ সম্পাদক কম. ডি রাজা, সি পি আই (এম)-এর পলিটব্যুরো সদস্য ও জননেতা কম. মহম্মদ সেলিম, আদিবাসী সম্প্রদায়ের নেত্রী কম. দেবলীনা হেমব্রম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন আর এস পি রাজ্য সম্পাদক কম. বিশ্বনাথ চৌধুরী, কম. সর্বানী ভট্টাচার্য প্রমুখ।

উল্লেখ্য, ব্রিগেড সমাবেশে আর এস পি পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে একটি বুক স্টল সংগঠিত হয়। বহু মানুষ উৎসাহ সহ এই বুক স্টলে এসে গণবার্তা এবং দলের পুস্তক পুস্তিকা সংগ্রহ করেন।

'আর এস পি'র বহু কর্মী ও সমর্থক সুদূর দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে পাঁচ-ছ'টি বাসে কলকাতায় আসেন। অনেকে রেলেও আসেন। হুগলীর খানাকুল অঞ্চল থেকেও বাস ভর্তি মানুষ আসেন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, হাওড়া, নদীয়া, হুগলী জেলার অন্যান্য অঞ্চল থেকে এবং বর্ধমান, পূর্ব মেদিনীপুরের ময়না অঞ্চল থেকেও বহু কর্মী সমর্থক বাসে বা ট্রেনযোগে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে পৌঁছে যান।

লক্ষ করা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের সবকটি জেলা থেকেই আর এস পি কর্মীরা বিশেষ উৎসাহ সহকারে ২৮ ফেব্রুয়ারির বিগ্রেড সভায় যোগ দেন। বেশ কয়েকজন আগের দিন সন্ধের মধ্যেই কলকাতায় পৌঁছে যান। অনন্য উৎসাহউদ্দীপনা সহ ব্রিগেড সভা সফল করার উদ্যোগ বিশেষ নজর কেড়েছে।

ব্রিগেড সমাবেশ সফল করতে আর এস পি'র কর্মীরা প্রায় সমস্ত জেলাতেই ধারাবাহিক পথসভা, পোস্টারিং, দেওয়াল লিখন এবং বাড়ি বাড়ি পৌঁছে সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন জানান। এমন উদ্দীপনা অতীতে প্রায় দেখা যায়নি। যে উৎসাহজনক পরিবেশ ব্রিগেড সমাবেশ কেন্দ্র করে দেখা গেল তা, অবশ্যই এই রাজ্যে সদর্থক পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে। রাজ্যের সাধারণ মানুষ গত দশ বছর যাবৎ যে করুণ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে এবং বিগত প্রায় সাত বছর যাবৎ যেভাবে একটি উগ্র সাম্প্রদায়িক দল বিজেপি এই রাজ্যে তাদের অশুভ প্রভাব বিস্তার করতে উদগ্র আচরণ করছে তা, সাধারণ মানুষের মধ্যে বিশেষ প্রতিরোধের মানসিকতা দৃঢ় করে তুলেছে।

দেশের সংবিধান পদদলিত হচ্ছে এবং নানাস্থানে অসহিষ্ণুতার বিস্তার ঘটানো হচ্ছে। নারীসমাজ বিশেষভাবে আক্রান্ত। ব্রিগেড সমাবেশ ফেরৎ বহু মানুষ বর্তমান সময়ের ভয়াবহ বাস্তব অবস্থা থেকে রাজ্যকে মুক্ত করতে দৃঢ়ভাবে পথ চলার বিষয় উল্লেখ করেছেন। বিজেপি'র সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের অরাজকতাপূর্ণ অপশাসন যে সাধারণ জীবনে চরম সমস্যা সৃষ্টি করে চলেছে তা, বহু মানুষের কথাতেই স্পষ্ট বলে প্রতিভাত হয়েছে। মানুষ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে উঠেছেন, যে কোনভাবেই বামপন্থী দলগুলির বিরুদ্ধে ক্রমাগত ষড়যন্ত্রগুলি আর চলতে দেওয়া যায় না। গ্রামে গ্রামে এই বার্তা পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে মানুষ এবার বিশেষ দৃঢ় অবস্থান নেবেন বলেই মনে হয়েছে।

৬ মার্চ সংযুক্ত মোর্চার ডাকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদ

রান্নার গ্যাস, পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন তেল সহ সমস্ত নিত্যব্যবহার্য সামগ্রীর দাম লাগামছাড়া হয়ে পড়েছে। বেশ কিছুকাল যাবৎ এইভাবেই জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের দখল নেবার পর থেকেই দায়িত্বজ্ঞানহীন মোদী সরকার শুধুমাত্র অতি অল্প সংখ্যক ধনিক শ্রেণির মানুষদের সন্তুষ্ট করতেই ব্যবস্থা নিয়ে চলেছে। সাধারণ মানুষের কোনও গুরুত্বই নেই। গত দুই এক মাসের মধ্যেই রান্নার গ্যাসের দাম অতীতের সমস্ত রেকর্ড ম্লান করে প্রায় ৯০০ টাকায় পৌঁছে যাচ্ছে। একসময় কেন্দ্রীয় জ্বালানি বিষয়ক মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের বক্তব্য ছিল রান্নার গ্যাসের দাম ৮৪৫ টাকায় বেঁধে দেওয়া হবে। এখন তিনি বলতে চেষ্টা করছেন ৯০০ টাকায় বেঁধে দেওয়া হবে। মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত পরিবারগুলির অশেষ দুর্গতি। দেশের দরিদ্র অংশের মানুষদের এমনিতেই যথোপযুক্ত খাদ্যের সংস্থান নেই। তার ওপর কেরোসিন এবং রান্নার গ্যাসের দাম প্রতিনিয়ত এভাবে বেড়ে যাবার ফলে গভীর সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বেড়ে যাবার ফলে ভারতে দাম বাড়ছে, এই অজুহাত কোনও যুক্তিতেই মেনে নেওয়া যায় না। বাস্তবের সঙ্গে এ ধরনের দাবির কোনও সম্পর্ক নেই। মোদীজি অনবরত মিথ্যা কথা বলে চলেন। তাঁর সহযোগীরাও একই বিদ্যায় পারদর্শী। আর সাধারণ মানুষের প্রাণান্ত। এমন দুর্দিন কখনোই স্বাধীন ভারতে আর আসেনি। সমস্ত দিক থেকেই এক ভীতিজনক পরিস্থিতি চলছে দেশজুড়ে। জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাবার ক্ষেত্রে মুখত দায়ী কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু রাজ্য সরকারেরও ভূমিকা আছে। তৃণমূল সরকার সব প্রসঙ্গেই মোদী সরকারের সঙ্গেই রয়েছে। ওপর ওপর বিরোধিতা যা চলে তা, শুধুই রাজ্যের মানুষকে প্রতারিত করার জন্য।

আগামী ৬ মার্চ শনিবার সংযুক্ত মোর্চার আহ্বানে রাজ্যের সবকটি বিধানসভা অঞ্চলে মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত হচ্ছে। কলকাতায় কেন্দ্রীয় মিছিল। দুপুর ৩.৩০ টায় এন্টালী মার্কেট অঞ্চল থেকে শুরু হবে। মিছিল যাবে মহাজাতি সদন পর্যন্ত। এই বিক্ষোভ মিছিলে রাজ্য বামফ্রন্ট, জাতীয় কংগ্রেস এবং ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের নেতৃত্ব অংশ নেবেন।

মোদী ৭ মার্চ কলকাতায় আসছেন। তিনি সোনার বাংলা গড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাংলার মানুষকে প্রতারিত করার অপকৌশল নিয়েছেন। কয়েক বছর আগে অসংখ্য মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ত্রিপুরার মানুষের চরম সর্বনাশ করে চলেছে বিজেপি। বাংলার মানুষকেও একইভাবে প্রতারিত করার উদ্যোগ নিয়েছে ঐ রাজ্যের বিজেপি। বাংলার মানুষকে সচেতন করে মোদী-শাহর এমন অপচেষ্টা রুখতেই হবে।

বিহার নির্বাচন ও পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের কাজ

তুষার চক্রবর্তী

বিহার বিধানসভার নির্বাচন কোভিডকালীন অভূতপূর্ব পরিস্থিতিতে, নির্ধারিত সময়ে ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফলও বেরিয়ে গেছে। কিন্তু, নির্বাচনের আগে যেমন ঘোড়দৌড়ের রেসের মতো এই নির্বাচনে ফলাফলের আগাম পূর্বাভাস ছাড়া অন্য কোনো সমাজ রাজনৈতিক আলোচনা গণমাধ্যমে তেমন পাত্তা পায়নি, তেমনি ফলপ্রকাশের পরেও এই নির্বাচন ও তার ফলাফলের বাস্তব হিসেবনিকেশ অথবা তাৎপর্য নিয়ে তেমন কোনো তথ্যভিত্তিক আলোচনা কোথাও নেই। অথচ নির্বাচন, বিশেষ করে তার পরিচালনার দিকটা ক্রমশ হয়ে উঠছে অত্যন্ত পেশাদার ও তথ্যভিত্তিক। নির্বাচনের আগে ও পরে, তথ্যের বিশদ বিচার বিশ্লেষণ তাই আজ অত্যন্ত জরুরি। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির প্রেক্ষিত অনেকাংশে ভিন্ন হলেও, কথাটা মাথায় রাখতে হবে।

আমরা চাই বা না চাই, ভারতে নির্বাচন ক্রমশ তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর পেশাদারিত্ব অর্জন করছে তা, অস্বীকার করার উপায় নেই। এ শুধু ফেসবুকের মতো সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারে সীমিত নেই। তার আড়ালে যে বিশ্লেষণ—ও তা বুঝে সত্যি-মিথ্যে প্রচারের কৌশল নিক্তি মেপে প্রযুক্ত হয়—সেটাই জরুরি। যুথবদ্ধ আচরণকে বিজ্ঞানের বা গণিতের নিয়মেই প্রভাবিত করতে পারে, যদি তা উপযুক্ত ফিডব্যাক সহ নিরন্তর ব্যবহৃত হয়। আজ, যে কোনো রাজ্যে বা কেন্দ্রে নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় এই জাতীয় প্রয়োগকে এড়িয়ে সাফল্য অর্জন করা বেশ কঠিন। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস ও ভারতীয় জনতা পার্টি এই ব্যাপারে অন্যদের থেকে অনেক এগিয়ে। এর জন্য অর্থ ও সামর্থ্য, দুটোই দরকার। জাতীয় কংগ্রেস, অর্থ ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কেন এই দিকে তেমন এগোয় নি সেটা অবশ্যই এক প্রহেলিকা। তেজস্বী যাদব বিহার নির্বাচনে নীতিশকুমারকে এই অস্ত্রেই অনেকখানি কাবু করেছেন, কিন্তু বিজেপিকে পারেন নি।

বিহার এবং উত্তরপ্রদেশে নির্বাচনী প্রচারে ও তা নিয়ে আলোচনায় অনেকখানি জায়গা দখল করে থাকে হরেকরকম জাতপাতের রাজনৈতিক সমীকরণ। কিন্তু, রাজনীতির হাওয়া বদল ঘটেছে। বিশ্বায়নের ধাক্কায় জাতপাতের প্রকোপ মিলিয়ে না গেলেও অনেকটা শিথিল হয়ে এসেছে। যাকো আরও আলগা করেছে তালিকার বাইরে থেকে ওবিসি এবং অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা ব্রাহ্মণদের সংরক্ষণের তালিকায় নিয়ে আসার প্রক্রিয়া অথবা কৌশল। এসব বিজেপি সুবিধেমতো প্রয়োগ করছে। ফলে, জাতপাতের রাজনীতির মেরুকরণ এখন অনেকটাই ভেস্তে গেছে। কতটা, তার সন্ধান নেওয়া দরকার। বিহারের নির্বাচন বিশ্লেষণে যা জরুরি।

মার্কসীয় শ্রেণিরাজনীতির দেশীয় বিকল্প হিসেবে জাতপাতের রাজনীতি প্রয়োগের প্রবক্তাদের মধ্যে ভারতে প্রায় শীর্ষে ছিলেন এদেশের সমাজবাদী আন্দোলনের নেতারাই। লালু প্রসাদের রাষ্ট্রীয় জনতা দল এই ধারার উত্তরাধিকারী। জাতপাতের সংঘাতকে ভারতে মার্কসীয় শ্রেণিসংগ্রামের রূপ হিসেবে প্রতিস্থাপিত করার পথে সম্প্রতি হাঁটতে শুরু করেছে নকশালপন্থী রাজনীতির একাংশ। তারা মনে করেন, বিহার নির্বাচনে তা কাজে লেগেছে। সত্যিই কি তাই?

নীতিশকুমার এবং লালুপ্রসাদ দুজনেই অবশ্য জাতপাতের ঘরানা থেকে উঠে আসা রাজনীতিবিদ। নীতিশকুমার বিজেপির হাত ধরার পরে এই রাজনীতি থেকে সরে এসেছেন। সরে এসেছেন সুশাসন ও বিকাশের রাজনীতির দিকে। কিন্তু, বিহারে শিল্পবিকাশের কোনো চিহ্নই তিনি ফোটাতে পারেন নি। ফলে সেই রাজনীতির পালে যে হাওয়া, তা আজ নীতিশের পক্ষে নেই। বিজেপি বিকাশ ও হিন্দুত্বের রাজনীতির মিশেলে নিজের জমি বিহারে পোক্ত করেছে। বেকারত্ব ছিল প্রধান ইস্যু, চাহিদা চাকরির। লালুর উত্তরাধিকারী তেজস্বী সেই পরিবর্তন বুঝতে ভুল করেন নি। জাতপাতের হাওয়া আগের মতো তীব্র থাকলে বিহারে ব্রাহ্মণ্যবাদী কংগ্রেস, যাদব ও মধ্যবর্গীয়দের প্রতিনিধিত্বকারী রাষ্ট্রীয় জনতাদল ও জনতার চোখে হরিজন-আদিবাসী দরদী বামশক্তির মহাজোটগঠন অসম্ভব হয়ে উঠত।

জাতপাতের আত্মপরিচিতির জোট রাজনীতি, হিন্দুত্বের দেশীয় জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক রাজনীতির ধাক্কাও সামলাতে পারছে না। এই সব সামাজিক পরিবর্তন নির্বাচনী রাজনীতিকে কিভাবে প্রভাবিত করছে তা, সমাজবিজ্ঞানের পদ্ধতিতেও বিচার বিবেচনা করা দরকার। ভারতে নির্বাচন, এই ধরনের সমাজ পরিবর্তন বুঝবার একটা মস্ত বড় অ-কর্ষিত ক্ষেত্র।

বিহার নির্বাচনে সবচাইতে লাভবান হয়েছে বিজেপি এবং সিপিআই এম এল-লিবারেশন। লিবারেশন সাফল্য পেয়েছে তেজস্বীর সঙ্গে জোটের সুবাদে। না হলে তাদের আসন সংখ্যা বাড়ার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। অর্থনৈতিক বিপর্যয়, কর্মহীনতা ও ফ্যাসিবাদী সংঘ রাজনীতির বিপদকে সামনে রেখে বিজেপি বিরোধী মহাজোট তৈরি হয়েছিল। ওপর থেকে দেখলে, একদিকে বিজেপি ও নীতিশকুমারের সংযুক্ত জাতীয় সমাজবাদী দল ও অন্যদিকে মহাজোট এই দুয়ের মেরুকরণের প্রয়াস বিহার নির্বাচনে সফল হয়েছে বলে মনে হতে পারে। বামেদের উল্লেখযোগ্য নির্বাচনী সাফল্য ও জেলবন্দি লালুপ্রসাদের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র তেজস্বী যাদবের নেতৃত্বে রাষ্ট্রীয় জনতা দলের বিজেপি'র চাইতে একটি আসন বেশি পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে উঠে আসা যার প্রমাণ। কিন্তু, বিজেপি'র নির্বাচনী সাফল্যের কথা ভুলে গেলেও চলবে না।

১১১টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজেপি জিতেছে ৭৪টি আসন। মুখে সম্মান দেখালেও, আশাপূরণে ব্যর্থতার দায় পুরোটাই নীতিশকুমারের ঘাড়ে সাফল্যের সঙ্গে চাপিয়ে দিতে সফল হয়েছে বিজেপি। নীতিশকুমার দক্ষ প্রশাসক হলেও, তাঁর সবকিছুর কৃতিত্ব একা নেবার মানসিকতা যাকে সফল করে তুলতে সাহায্য করেছে। এবং বিহারের মানুষের সামনে নিজরাজ্যের উন্নয়ন বা বিকাশ যে এখনো প্রধান নির্বাচনী ইস্যু—সমস্ত সমীক্ষায় সেটাই দেখা গেছে। ফলাফল প্রমাণ করছে যে, বিজেপি'র ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের বিপদ কিন্তু নির্বাচনে জনতার দরবারে রাজ্যের সামনে প্রধান বিপদ হিসেবে দাগ কাটতে পারেনি। আবার হিন্দুত্ব ও মেরুকরণের রাজনীতিও সম্পূর্ণ সফল হয়নি। সেই কারণেই, মেরুকরণের নির্বাচনী রাজনৈতিক মডেল, তা সাম্প্রদায়িক লাইনেই হোক অথবা ফ্যাসিবাদ বিরোধিতার লাইনে, বিহারের নির্বাচনে অনেকটাই বিফল হয়েছে। সুতরাং, সেই লাইনে, পশ্চিমবঙ্গে বা অন্যত্র, বিহার নির্বাচনকে আদর্শ হিসেবে নিলে আমরা ভুল করব।

বিহার নির্বাচনের ফলাফল দেখিয়ে দিয়েছে যে বিজেপিই হোক বা তার বিরোধী জোট, দুই তরফই প্রায় সমান সমান, অর্থাৎ ৩৭.২ শতাংশ ভোট পেয়েছে। জয় ও পরাজয়ের তফাৎ ছিল মাত্র ১২৭৫৮ ভোটের। আসন সংখ্যায় ফারাকটাও খুব সামান্য। কিন্তু, ২৫.৫ শতাংশ ভোট মেরুকরণের বাইরে থেকেছে। এটা ১০ শতাংশ আসেপাশে থাকলে মেরুকরণ সফল হয়েছে বলা যেত। মেরুকরণ যে পুরোপুরি বা স্থায়ী ভাবে দাগ কাটেনি, তা ফলাফল আরেকটু কাটাছেঁড়া করলেই আরও স্পষ্টভাবে নজরে আসবে।

এবার বিহারে ভোট হয়েছে মোট তিন দফায়। প্রথম দফায় বিজেপি'র এনডিএ জোট পেয়েছিল ৩৬ শতাংশ ভোট এবং মহাগঠবন্ধন পায় ২৭ শতাংশ ভোট। প্রথম দফায় ৩৬ শতাংশ, অর্থাৎ বেশিরভাগ ভোট ছিল মেরুকরণের বাইরে। দ্বিতীয় দফায় ছবিটা খানিকটা বদলে যায়। মহাগঠবন্ধন পায় ৩৮ শতাংশ, এনডিএ জোটের ভোট থেকে যায় ৩৬ শতাংশ, আর মেরুকরণের বাইরের ভোট বেশ কিছুটা কমে ২৬ শতাংশ হয়ে যায়। সুতরাং, প্রথম ও দ্বিতীয় দফায় মেরুকরণ কাজ করেনি। কিন্তু তৃতীয় দফার ভোটে ছবিটা বদলে যায়। মহাগঠবন্ধন তৃতীয় বা শেষ দফায় পায় ২৭ শতাংশ ভোট, যা প্রায় প্রথম দফার মতোই। কিন্তু এই পর্বে মেরুকরণ কি তা বোঝা যায়। এন ডি এ জোট পায়, অপর পক্ষের দ্বিগুণেরও বেশি, অর্থাৎ ৭১ শতাংশ ভোট। দুই জোটের বাইরে থাকে মাত্র ২ শতাংশ ভোট। কি কারণে তিনপর্বের ফলাফলে এই রকম তফাৎ হলো তা ভাববার মতো। নির্বাচনী প্রচার ও কৌশলের মধ্যে, পরিচালনার মধ্যে, খুব সম্ভবত উত্তরটা লুকিয়ে আছে। আর, দেখা যাচ্ছে দ্বিমুখী মেরুকরণ আংশিক হলেও, তাতে লাভবান হয়েছে বিজেপি।

তলায় তলায় নির্বাচনের জটিলতা ধরা পরে যাবে বয়েস ও লিঙ্গভিত্তিক বিশ্লেষণে। এই তথ্যগুলিও খুব সহজেই ফলাফল থেকে পাওয়া যায়। বিহার ভোটের ফলাফলে অনেকেই বলছেন যে, তরুণ নেতা তেজস্বীকে দেখে তরুণেরা নাকি মহাগঠবন্ধনের ঝুলিতে বেশি ভোট দিয়েছেন, বিপক্ষকে কম। কিন্তু, ভোটের তথ্য তা সমর্থন করে না। দুই জোট ১৮-২৯, ৩০-৩৯, ৪০-৪৯ এবং ৫০-৫৯ এই সব বয়েসেই প্রায় সমান সমান ভোট পেয়েছে। বরং ৬০-৬১ বছরের ভোটারদের ভোট সামান্য হলেও একটু বেশি পেয়েছে মহাগঠবন্ধন। অথচ, সংবাদমাধ্যম, আন্দাজে ভুল কথা প্রচার করছে। লিঙ্গভিত্তিক বিশ্লেষণেও যা যা বলা হচ্ছে তা তথ্যে টেঁকে না। কোনো মেরুকরণের চিহ্ন এ সব ক্ষেত্রে নেই।

তথ্য ও তথ্যভিত্তিক যুক্তি থেকে রাজনৈতিক প্রচার কিন্তু ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। এই প্রবণতার মূলে কি কারণ থাকতে পারে সেটাও ভাববার মতো। এখনকার রাজনীতিবিজ্ঞান বলছে আসলে যুক্তি তর্ক তথ্য এর কোনটাই যে ভোটারদের নির্বাচনী সিদ্ধান্তকে নিরূপিত করে এমন নয়। রাজনীতিবিজ্ঞানের পণ্ডিতরা বলেন, মগজের যে অংশ নির্বাচন ও রাজনৈতিক পক্ষপাত নিয়ন্ত্রণ করে তা আবেগে সাড়া দেয় বেশি, গণিতে কম। রাজনৈতিক অংক ও সমীকরণ সত্যি বলি বিশ্বাস করলে তাই ঠকে যাবার ঝুঁকি বাড়ে বৈ কমে না। কিন্তু, তার চাইতেও বড় কথা হলো, সব ভোট সমান নয়। উত্তেজনার আঁচ থেকেই তা প্রাথমিকভাবে টের পাওয়া যায়। বিহারের এই ভোট কেমন ছিল সেটাও জানা দরকার।

ভোটকে এখন দুটি বর্গে ভাগ করে দেখা যেতে পারে। ভোটযুদ্ধ ও ভোট-প্রতিযোগিতা। ভোটযুদ্ধ মানে ভোটে গোলাবারুদের প্রভাব বা সন্ত্রাসের ভূমিকার উল্লেখ করছি এমন নয়। সেই

এরপর ৮-এর পাতায়

পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান সম্প্রদায়কে 'অপর' চিহ্নিত করাই বিজেপি'র লক্ষ্য

২০২১ এর বিধানসভা নির্বাচনের পর্বের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যবাসী ঢুকে পড়েছে। যতই দিন যাচ্ছে রাজ্যের শাসকদল থেকে ঝাড়ে বংশে দুর্বৃত্তদঙ্গল বিজেপিতে গিয়ে ভিড় করছে। প্রচার মাধ্যমের কাছে তৃণমূল কংগ্রেস আর বিজেপি'র বিবাদ, কোন দল কত দুর্নীতি করেছে, কে কার কত রক্ত ঝড়িয়েছে এই বিষয়গুলি এতদিন পর্যন্ত সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত ভোটে তৃণমূল কংগ্রেস যেভাবে ৪০ শতাংশ আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছিল, তখন থেকেই গ্রামাঞ্চলের মানুষের একাংশ, এমনকি বাম কর্মী ও সমর্থকদের অনেকে পর্যন্ত শুধুমাত্র নিরাপত্তার জন্য সর্বভারতীয় দুর্বৃত্তদের নেতৃত্বে সংখ্যাগুরু ফ্যাসিবাদী দলের আশ্রয় খুঁজেছে। এই ধরনের দুটি শিবিরের ভাগাভাগির জন্য বামপন্থীদের সাংগঠনিক দুর্বলতাও যথেষ্ট দায়ী। তপ্ত কড়াই থেকে সরাসরি জ্বলন্ত উনোনে ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগেই কর্পোরেট প্রচারমাধ্যম বিজেপি'র আইটি সেলের সহযোগিতায় বাম সমর্থকদের মধ্যে এক ভয়ঙ্কর হুইসপারিং ক্যাম্পেইন চালায় "আগে রাম, পরে বাম"; অর্থাৎ তৃণমূল সরকারকে গদি থেকে হঠাতে আপাতত অনেক বেশি টাকা ও বাহুবলীর ভিড়ে ঠাসা দলকে জেতাতে হবে। গত লোকসভা ভোটে বিজেপি এই প্রচারের ফল হাতে নাতে পেয়েছে। দশ বছর আগেও পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক দল হিসেবে যাদের শুধু অস্তিত্ব ছিল, তারাই একটি শক্তিশালী দলে পরিণত হয়েছে।

আর পশ্চিমবঙ্গের বহুত্ববাদী সমাজে যতই এই প্রতিক্রিয়াশীল দলটি শক্তিশালী হয়ে উঠছে, ততই সংঘপরিবারের নির্মিত এবং পোষিত কতগুলি গালগল্প বা 'মিথ' বিষাক্ত গ্যাসের মতো সামাজিক-সাংস্কৃতিক দূষণ ঘটাচ্ছে। বানানো মিথ্যে তথ্য অজস্র মিথ্যে ও অর্ধসত্য ঘটনার সঙ্গে ককটেল করে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের কাজ করে চলেছে। বিজেপি এবং সংঘ পরিবার। বিপরীত মেরুতে তৃণমূলও তার সুযোগে সংখ্যালঘু ভোটকে নিজেদের ভোটব্যাঙ্কে পরিণত করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে।

প্রথমত এরা প্রচার করছে আমাদের রাজ্যে নাকি আশেপাশের বিশেষ করে বাংলাদেশের সীমানা পেরিয়ে কোটি কোটি মুসলমান জনতার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। সেই কারণেই অনুপ্রবেশ রুখতে নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন, জাতীয় নাগরিক পঞ্জী ও জাতীয় জনসংখ্যা পঞ্জী বা সি (এ) এ, এন আর সি এবং এন পি আর পশ্চিমবঙ্গে অবিলম্বে চালু করা দরকার। নির্বাচনে রাজ্যে ক্ষমতাসীন হলে এই সব আইনের প্রয়োগে অনুপ্রবেশকারীদের 'নাকি ঘাড়ে ধরে সীমান্তের ওপারে পার করে দিয়ে' হিন্দুদের চাকরিবাকরি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার ঢালাও ব্যবস্থা করা যাবে। রাজ্য বিজেপি'র মহাপণ্ডিত (!) সভাপতি দিলীপ ঘোষ, যিনি মমতা ব্যানার্জীর সঙ্গে কুকথার প্রতিযোগিতায় দড়, সোচ্চারে বলে থাকেন এ রাজ্যে নাকি এক কোটিরও অনেক বেশি মুসলমান বেআইনি অনুপ্রবেশকারীকে তাড়াতে বিজেপি বদ্ধপরিকর।

আর একটি গালগল্প হিন্দু মধ্যবিত্তের একাংশের মধ্যে (অবশ্যই গরিব হিন্দু, মুসলমান, আদিবাসী, দলিত নয়) অনেকদিন ধরেই চালু আছে যে, মুসলমানদের পরিবারে নাকি গড়ে ৫ থেকে ৮ জন করে সন্তান জন্ম নেয়। এই অতিরিক্ত বেড়ে ওঠা জন্মহার যদি চলতেই থাকে তবে কয়েক বছরের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানরা নাকি সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় হয়ে দাঁড়াবে।

তৃতীয় প্রচারটি হল, পশ্চিমবঙ্গে স্বাধীনতার পর থেকে যে সরকারই এসেছে, কংগ্রেস, যুক্তফ্রন্ট, বামফ্রন্ট এবং বর্তমানের তৃণমূল কংগ্রেস সরকার, প্রত্যেকেই নাকি মুসলমানদের তোষণ করে বাড়তি সুযোগ সুবিধা দিয়েছে। বিজেপি'র স্পষ্ট ঘোষণা, এই ধরনের সংখ্যালঘু তোষণ বন্ধ করে সংখ্যাগুরুদের সুযোগ এবং অধিকার বাড়াতে বিজেপি নাকি বদ্ধপরিকর।

রাজ্যে যে দলটি প্রতিটি ক্ষেত্রে মুসলমান, দলিত এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে 'অপর' বলে চিহ্নিত করে দেশের সর্বজনীন অধিকার থেকে বঞ্চিত করার কথা নির্দ্বিধায় বলতে পারে, কিভাবে জাতধর্মসম্প্রদায় নির্বিশেষে দুর্বৃত্ত ও মারাত্মক অপরাধ চোরাইচালান, গুন্ডামী হত্যা ধর্ষণে, অভিযুক্ত তৃণমূলের দুর্বৃত্তদঙ্গলকে নির্বিচারে সি বি আই, ইডি-আইটিরি আগ্রাসন থেকে আশ্রয় দিয়ে দলের ঝান্ডা ধরিয়ে দিচ্ছে ভাবলে স্তম্ভিত হতে হয়।

বেআইনি সংখ্যালঘু অনুপ্রবেশ?

সম্প্রতি একটি প্রখ্যাত ইংরেজি পাক্ষিক পত্রিকায় অর্থনীতিবিদ শুভনীল চৌধুরী এবং শাশ্বত ঘোষ যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান পরিবেশন করে দেখিয়েছেন যে বিজেপি নেতাদের গালগল্প যদি বিন্দুমাত্র সত্যি হত তবে এতদিনে সারা দেশের তুলনায় বাংলায় মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কয়েক গুণ বেশি হত।

সেন্সাস কমিশনার, জি ও আই, ২০১৯-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী

- ১৯৫১-৬১ সালের মধ্যে দেশভাগ ইত্যাদি কারণে ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২২ শতাংশ, পশ্চিমবঙ্গে ৩৩ শতাংশ।
- ১৯৬১-৯১ সালের মধ্যে দশ বছরে ভারত এবং পশ্চিমবঙ্গে উভয় জায়গাতেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২২ থেকে ২৫ শতাংশের মধ্যে।
- ১৯৯১-২০০১ সালের মধ্যে ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২২ শতাংশ, পশ্চিমবঙ্গে ১৭ শতাংশ।
- ২০০১-১১ সালে সারা ভারতে ১৭ এবং পশ্চিমবঙ্গে ১৩ শতাংশ;
- ২০১১-২০২১ সালে ভারতে ১৩, এরাজ্যে ৭ শতাংশ;

সুতরাং বিজেপি'র যুক্তি খাটে না। এরাজ্যে যদি ঢালাও বেআইনি বাংলাদেশী মুসলমানদের অনুপ্রবেশ ঘটত, তবে সারা ভারতের তুলনায় ক্রমশ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার পশ্চিমবঙ্গে এত কমে যেত না।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন জেলার, বিশেষ করে সীমান্তবর্তী জেলা নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুর ইত্যাদি জেলার সঙ্গে পুরুলিয়া বর্ধমান প্রভৃতি জেলার হিন্দু বনাম মুসলিম জনসংখ্যার বৃদ্ধির হারের তুলনায় এমন কিছু পার্থক্য দেখা যায় না, যাতে প্রমাণ হয় যে বাংলাদেশ থেকে ক্রমাগত অনুপ্রবেশ হচ্ছে। বরঞ্চ দেখা যাচ্ছে বছরে বছরে হিন্দু মুসলমান উভয়েরই এরাজ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমছে।

মুসলমান পরিবারে সন্তান জন্মানোর হার নাকি অনেক বেশি?

বিজেপি এবং সংঘ পরিবারের দ্বিতীয় অভিযোগ যে মুসলমান পরিবারে সন্তান জন্মানোর হার, ফার্টিলিটি রেট নাকি হিন্দুদের তুলনায় এত বেশি যে, কয়েক বছরের মধ্যেই হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়বে—একটি বিদ্বেষমূলক ডাহা মিথ্যা। কোনো পরিসংখ্যানেই তা প্রমাণিত হয় না, দেখিয়েছেন শুভনীল চৌধুরী এবং শাশ্বত ঘোষ।

বিশ্বব্যাঙ্কের উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্য থেকে লেখকদ্বয় দেখিয়েছেন যে মুসলমান সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মানুষ যেসব দেশ, অর্থাৎ বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ, পাকিস্তান এবং অবশ্যই ভারতে মায়েদের সন্তান উৎপাদনের হার সম্প্রদায় বা ধর্মের উপর নির্ভর করে না। নির্ভর করে শিক্ষা এবং জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নের উপর।

২০১৮ সালের ফার্টিলিটি রেট

দেশ	ফার্টিলিটি রেট
বাংলাদেশ	২.০
ইন্দোনেশিয়া	২.৩
ইরান	২.১
মালয়েশিয়া	২.০
মালদ্বীপ	১.৯
পাকিস্তান	৩.৫
ভারত	২.২

২০১১র সেনসাস এবং ২০১৫-১৬র ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভের তথ্যে পশ্চিমবঙ্গের ফার্টিলিটি রেট সম্বন্ধে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় লক্ষ করা গেছে। ২০১১ সালে ফার্টিলিটি রেট সারা রাজ্যে ছিল ১.৭, হিন্দুদের ১.৭ এবং মুসলমানদের ২,২; ২০১৫ সালে রাজ্যের ফার্টিলিটি রেট ১.৮, হিন্দুদের কমেছে ১.৬ এবং মুসলমানদের কমেছে ২.১; গবেষকদ্বয় ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ফার্টিলিটি রেটের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন সমস্ত রাজ্যের মধ্যে বিহার এবং উত্তরপ্রদেশে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই ফার্টিলিটি রেট ২.৫ এর বেশি। জীবনযাত্রার মানই যে প্রকৃত নির্ধারক ধর্ম বা সম্প্রদায় নয় সেই বিষয়টিই বার বার প্রমাণিত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান তোষণ?

এই বিষয়টি নিয়ে চিরকাল বাজার গরম করেছে বিজেপি। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে হিন্দু ভোটের মেরুকরণ করার জন্য অনুপ্রবেশ, জন্মহার ইত্যাদি বিষয়ে বার বার গোয়েবলসীয় কায়দায় মিথ্যার পুনরুচ্চারণ করে যাচ্ছে। এই বিষয়গুলিতে সেভাবে চিঁড়ে না ভিজলে অবশেষে এ রাজ্যে মুসলমান তোষণ রাজনৈতিক দলগুলির ধর্ম, এই বিষয়টি নিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের বেকার যুবকদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভাবপ্রবণতাকে পুঁজি করে সমর্থন আদায় করতে উঠে পড়ে লেগেছে বিজেপি।

লেখকদ্বয় পিরিয়ডিক লেবার ফোর্স সার্ভে ২০১৮-১৯-এর পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান জনসংখ্যার মোট ৫২.৭ শতাংশ স্বনিযুক্ত উপায়ে জীবিকা উপার্জন করেন। সারা ভারতের হিসেবও একই। পশ্চিমবঙ্গে মাত্র মুসলমান জনসংখ্যার ১৩ শতাংশ নিয়মিত বেতন বা মজুরির কর্মসংস্থানে নিয়োজিত। সারা ভারতে এই হিসেব অনেক বেশি ২২.১ শতাংশ।

এরাজ্যে অস্থায়ী কাজে যুক্ত মুসলমান শ্রমশক্তির ৩৪.৩ শতাংশ। সারা দেশে তা ২৬ শতাংশ। সারা ভারতের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে ভীষণ বিপজ্জনক অস্থায়ী কাজের সঙ্গে যুক্ত মুসলমান শ্রমিকের সংখ্যা সারা দেশের তুলনায় অনেক বেশি। কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার ক্ষেত্রেও এদের সংখ্যা বেশি। কর্মসংস্থানের পরিসরে দেখা গেছে স্ব-নিযুক্ত কাজে মুসলমান শ্রমিকের গড় আয় ৬.১৯৭ টাকা প্রতি মাসে। সেখানে সারা দেশের গড় আয় ১০,১৯২ টাকা।

এরাজ্যে জনসংখ্যার ২৭ শতাংশ মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক অধ্যাপকের হার ২০১৮-১৯ এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৭.৮ শতাংশ।

এই ধরনের অসংখ্য তথ্য দিয়ে প্রতিটি গণতান্ত্রিক উন্নয়নের পরিসরে মুসলমান তোষণ তো নয়ই, বরঞ্চ এই সম্প্রদায়ের তুলনামূলক বঞ্চনায় ছবিটাই ফুটে ওঠে। রাজ্য সরকার মেরুকরণের প্রতিযোগিতায় ইমামদের ভাতা দিয়ে বিজেপি'র প্রচারের মিথটাকে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ বাড়িয়ে দিচ্ছে মাত্র।

শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, সারা ভারতে বিজেপি'র হিন্দুরাষ্ট্র গঠনের প্রকল্পে যেভাবে মুসলমান জনসংখ্যার বিস্ফোরণের তত্ত্ব প্রচার করা হয়, তা একটি জ্বলজ্যান্ত মিথ্যা প্রচার। হিন্দুজাতির মরণোন্মুখ প্রবণতা ঠেকাতে হলে যে সব মুসলমান বিরোধী জনসংখ্য নিয়ন্ত্রণের সরকারি নীতি সি এ এ, এন পি আর, এন আর সি'র সঙ্গে জোর করে গর্ভনিরোধক আইনে মুসলমানদের সন্তান সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করার পক্ষে যুক্তি সাজাচ্ছে সংঘ পরিবার, তা ভারতের বহুত্ববাদকে সুনিশ্চিত ভাবেই ধ্বংস করার পথে যাচ্ছে।

সারা ভারতের তথ্য পরিসংখ্যানের হিসেব দেখা যাচ্ছে

- ২০০১-২০১১ সালের মধ্যে মুসলমান জনসংখ্যা ৫ শতাংশ কমেছে, যেখানে হিন্দুদের জনসংখ্যা কমেছে ৩ শতাংশ।
- পূর্ববর্তী দশক অর্থাৎ ১৯৯১-২০০১ সালের মধ্যেও মুসলমান জনসংখ্যা হিন্দুদের তুলনায় বেশি শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

স্বাধীনতা পরবর্তী সুদীর্ঘ সত্তর বছরের হিসেবটা অবশ্যই অন্যরকম। হিন্দুদের জনসংখ্যা হ্রাস পেতে শুরু করে ১৯৮০-র দশক থেকে, কিন্তু মুসলমান জনসংখ্যা হ্রাস পেতে শুরু করে এক দশক পর অর্থাৎ ১৯৯০ সাল থেকে। এই কারণেই উভয় সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের মধ্যে এখনও গড় পার্থক্য বর্তমান।

আসলে কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ করে মোদী সরকার সারা দেশের পরিপ্রেক্ষিতে অবন্নোয়ন এবং অসম বিকাশের নগ্ন চিত্রটি গোপন করার লক্ষ্যে জনসংখ্যা বনাম শিক্ষা স্বাস্থ্য পরিষেবা ইত্যাদির এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অঞ্চলভেদে নির্ভর তথ্য গোপন করে অথবা বিকৃত করে। যেমন দেখা গেছে দক্ষিণ ভারতে গত এক দশকে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ১.৭ শতাংশ, জাতীয় গড় ১৯ শতাংশের অনেক কম। কেরালা এবং তামিলনাড়ুতে আবার তা দক্ষিণ ভারতের গড়ের চেয়েও কম। এই দুটি রাজ্যে শুধু মুসলমান নয়, হিন্দু সম্প্রদায়ের পরিবারেও মায়েদের সন্তান জন্মানোর হার বিহার উত্তরপ্রদেশের চেয়ে অনেক কম। অর্থাৎ সর্বভারতীয় স্তরেও প্রমাণিত যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি বা হ্রাস নির্ভর করে সর্বজনীন উন্নয়ন এবং উন্নত সামাজিক অর্থনৈতিক তথা সাংস্কৃতিক পরিকাঠামোর উপর। এই কথা কি প্রমাণ হয় না যে গর্ভনিরোধক প্রযুক্তি বা বহিরাগত মুসলমান অনুপ্রবেশ একটি বাহানা মাত্র। সামাজিক, শিক্ষাগত ও আর্থিক তথা সাংস্কৃতিক পরিকাঠামোর উন্নয়নই প্রকৃত বাস্তব জন্ম নিরোধক।

- ভারতে ৮টি অপেক্ষাকৃত অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া রাজ্যে মুসলমান জনসংখ্যার গড় জাতীয় হারের তুলনায় (১৪.২ শতাংশ) মুসলমান জনসংখ্যার হার বেশি। আবার ৪টি রাজ্যে তা জাতীয় গড়ের তুলনায় কম। লাক্ষাদ্বীপে যেমন ৯০ শতাংশ অধিবাসী মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার জাতীয় হারের তুলনায় অনেক কম।
- ইতিমধ্যেই ২০০১-২০১১ সালের মধ্যেও উত্তরপ্রদেশে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্য। ৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। বিহারে হ্রাস পেয়েছে ৩.৫ শতাংশ। শুধু তাই নয় মুসলমান নারীদের গড় বিয়ের বয়স ক্রমশ এইসব রাজ্যে কেরালা এবং তামিলনাড়ুর কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে।

সুতরাং বিজেপি/সংঘ পরিবারে Whats App University'র শিক্ষার বিরুদ্ধে এবং তাদের নির্মিত গালগল্পের বিরুদ্ধে প্রকৃত তথ্যগুলি তুলে ধরতে হবে। কেরালা এবং তামিলনাড়ুতে যেভাবে যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা, কারিগরী দক্ষতা শারীরিক ব্যায়াম ইত্যাদি সমন্বিত পরিকাঠামোর উপর জোর দেওয়া হচ্ছে, সেভাবেই একটি সুষম উন্নয়ন সমন্বিত ভারত গঠনই একমাত্র সংঘ পরিবারের ভয়ঙ্কর প্রকল্পটিকে উৎখাত করতে পারে।

সূত্র : Mayank Mishra, Indian Express

Myth's about Muslim in Bengal by Shubhonil Chowdhury & Saswata Ghosh, Front Line, 12 March.

মার্কিন-ইরান পারমাণবিক চুক্তির পুনরুজ্জীবিত হওয়ার সম্ভাবনা

দিলীপ গোস্বামী

সদ্য প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের অবি-মৃষ্যকারিতায় মার্কিন-ইরান পারমাণবিক চুক্তিটির পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটতে বসেছে। নতুন রাষ্ট্রপতি জো বাইডেনের কাছে এই মৃতপ্রায় চুক্তিটিকে বাঁচিয়ে তোলার একটা সুযোগ এসেছে। এই সুযোগ কাজে লাগাতে না পারলে বাইডেন প্রশাসন এক বিরাট ভুল করবে। মধ্যপ্রাচ্যে স্থিতিশীল শান্তির এক সম্ভাবনা ব্যর্থ হতে পারে। বারাক ওবামার আমলে সম্পাদিত পারমাণবিক চুক্তিটিতে প্রাণ সঞ্চারের জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। না হলে দু পক্ষই এক কূটনৈতিক ভুলের জন্য দায়ী থাকবে।

আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই জো বাইডেন এবং তাঁর ক্যাবিনেট সদস্যরা মার্কিন বিদেশনীতির নতুনভাবে মূল্যায়নের কাজ শুরু করবে। চিন-রাশিয়া সম্পর্কে আমেরিকার বিদেশনীতির বিস্তারিত পর্যালোচনা প্রয়োজন—এ কাজটা ফেলে রাখা যায় না। আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহারের প্রশ্নও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর বিষয়। দেশের নিরাপত্তার স্বার্থের কথা মাথায় রেখে জাতীয় অর্থনীতির পুনর্বিন্যাসও প্রয়োজন। মাত্রাতিরিক্ত সংরক্ষণবাদের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিল ডোনাল্ড প্রশাসন। এদিকটাতেও জো বাইডেনকে নজর দিতে হবে। এত সব জটিল সমস্যার মাঝে Joint Comprehensive Place of Action বা (JCPOA) বা মার্কিন ইরান পারমাণবিক চুক্তি পুনরুজ্জীবিত করাটা বেশ সহজ কাজই মনে হয়। প্রয়োজন শুধু উভয় পক্ষের সদিচ্ছা ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি।

বারাক ওবামার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্য পাঁচটি দেশ ২০১৫ সালে যে পারমাণবিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল, জো বাইডেন সেই ঐতিহাসিক চুক্তিকে পুরোপুরি সমর্থন জানিয়েই হোয়াইট হাউসে পদার্পণ করেছেন। মজার ব্যাপার, কেবলমাত্র ওবামার উদ্যোগে এই চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল বলেই ট্রাম্প একে বাতিল করেছিলেন। মনে হয় না অন্য কোনও বুদ্ধিগ্রাহ্য কারণ ছিল, ১৫৯ পৃষ্ঠার এই বিশাল চুক্তির মোদ্দা কথা ছিল ইরান তার পারমাণবিক প্রকল্পের যাবতীয় কাজ বন্ধ রাখবে, পাশাপাশি আমেরিকা এবং চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী পাঁচটি দেশ ইরানের উপর চাপিয়ে দেওয়া নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করবে। বাইডেন প্রশাসনে জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় কর্মরত অধিকাংশ উপদেষ্টারা বারাক ওবামার আমলেও JCPOA-র বাস্তবায়নে প্রত্যক্ষভাবেই অংশগ্রহণ করেছিলেন। এঁরা কেউই সেই আমলে JCPOA র বিরোধিতা করেছিলেন, এমনটি শোনা যায় নি।

জানা গেল ফ্রান্সের বিদেশমন্ত্রী JCPOA নিয়ে ইউরোপের প্রথম সারির কূটনীতিকদের সঙ্গে প্রথমে এই চুক্তি রক্ষা করার লক্ষে এক দফা আলোচনা সারবেন। অপরদিকে বি বি সি সূত্রের খবর ইরানের প্রেসিডেন্ট হামান রৌহানি বার্তা দিয়েছেন, ইরান আমেরিকার দাবি মেনে চলতে প্রস্তুত আছেন, তবে আমেরিকা এবং বাকী স্বাক্ষরকারী দেশগুলিকেও নিষেধাজ্ঞা তোলার ব্যাপারে ইতিবাচক পদক্ষেপ নিতে হবে। আমেরিকা এক পা এগোলে, ইরানও এক পা এগোবে। যদি আমেরিকা সব পদক্ষেপই একসঙ্গে করতে চায়, ইরানও তাই করবে।

মনে হয় সমস্যার সমাধানের পথটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। যদি ইউরোপীয়ানরা এমন কোনও ফর্মুলা বের করে, যাতে ইরান আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন এক সঙ্গে International Atomic Energy Commission এর তদারকিতে কাজটা শুরু করে, বিষয়টির নিষ্পত্তি সম্ভব, চমক দেওয়ার কূটনীতির অঙ্গ হিসাবে জো বাইডেন ২৫ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার বলেছেন, আমেরিকা এবং অপর পাঁচ দেশ ইরানের সঙ্গে অবিলম্বে আলোচনায় বসতে চান এবং এই বৈঠকেই ঠিক করা হবে কখন কিভাবে চুক্তির পুনরুজ্জীবন কাজ শুরু করা হবে।

দুনিয়ার শান্তিকামী মানুষ অপেক্ষায় থাকবে কখন সেই শুভমুহূর্ত আসবে।

ইতিমধ্যেই আচমকাই খবর এসেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সিরিয়ার ইরানের মদতপুষ্ট মিলিশিয়াদের ঘাঁটিগুলির উপর বিমান হানা চালিয়েছে। আমেরিকার অভিযোগ, ইরানের মদতপুষ্ট মিলিশিয়া গোষ্ঠীর ওই অঞ্চলে মার্কিন সেনাবাহিনীর ঘাঁটিগুলির উপর গত দু'সপ্তাহ ধরে রকেট হামলার জবাবেই আমেরিকার এই বিমান হানা।

পেন্টাগনের মুখপাত্র এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের নির্দেশেই সিরিয়ায় এই বিমান হানা সংগঠিত হয়েছে।

প্রসঙ্গত, জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট পদে অভিষিক্ত হওয়ার পর এই প্রথম অন্য দেশে মার্কিন বিমানবাহিনীর আকমণ ঘটল, যা ইরানের সঙ্গে পারমাণবিক চুক্তি পুনরুজ্জীবনের প্রক্রিয়ায় অবাঞ্ছিত জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। সদ্য অভিষিক্ত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সেনাবাহিনীর হানাদারি রাজনৈতিক মহলের কাছে এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা। যদি বাইডেন সত্যিই তাঁর সেনাবাহিনী রক্ষায় আন্তরিক হন, তাহলে সিরিয়া থেকে দেশের মাটিতে সেনা ফিরিয়ে আনাটাই প্রাথমিক কর্তব্য ছিল। সিরিয়ার উপর বোমাবর্ষণ নয়।

প্রসঙ্গত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গত আট বছরে সিরিয়ায় ২০,০০০ বারেরও বেশি বোমা বর্ষণ করেছে। গত সপ্তাহে উত্তর-পূর্ব সিরিয়ার সীমান্তের মার্কিন বিমান হানা ২২ মিলিশিয়ার মৃত্যু দুঃখজনক ঘটনা হলে এবং ক্ষমতাসীন হওয়ার মাত্র পাঁচ সপ্তাহের মধ্যেই প্রেসিডেন্ট বাইডেনের এ হেন আচরণ অবশ্যই হতাশাব্যঞ্জক, বাইডেনের নানা ঘোষণায় এমনটাই মনে হয়েছিল, নতুন রাষ্ট্রপতি তাঁর পূর্বসুরী ট্রাম্পের ব্যর্থ নীতিগুলি পরিত্যাগ করতে অবশ্যই সচেষ্ট হবেন।

কংগ্রেসের কতিপয় সদস্যদের অভিযোগ, বাইডেন তাঁর ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন, আন্তর্জাতিক আইন এবং মার্কিন সংবিধান বিরোধী কাজই করেছেন। ২০১৬ সালে ভাইস প্রেসিডেন্ট পদ প্রার্থী টিম কেইটি দাবি করেছেন, আমেরিকার নাগরিকদের কাছে অকারণে এমন অবৈধ আচরণের জন্য জবাবদিহি করতেই হবে। তাছাড়া কংগ্রেসের সম্মতি বিনা এমন সামরিক অভিযান সংবিধান সম্মত নয়। জরুরী পরিস্থিতি ছাড়া এই সামরিক অভিযান সমর্থনযোগ্য নয়।

মুষ্টিমেয় দক্ষিণপন্থী সিনেট সদস্য ছাড়া অধিকাংশ কংগ্রেস সদস্য বাইডেনের আচরণের বিরোধিতাই করেছেন।

প্রসঙ্গত সিরিয়া সীমান্তের ভেতরে মার্কিন সেনাবাহিনীর ঘাঁটি থেকে কয়েক শ মাইল দূরে অবস্থিত ইরাকী শিয়া মিলিশিয়াদের উপর বিমান হানা এক রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত, রণকৌশলগত নয়। ইরাকের অভ্যন্তরে কর্মরত মিলিশিয়া বাহিনী আসলে ইরাকী সেনাবাহিনীরই অংশ, ইরাকের মাটিতে মিলিশিয়া বাহিনীর উপর বিমান হানার তীব্রতর আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া হতে পারে বলেই সিরিয়ার মাটিতে এই বিমান হানা অনৈতিক হলেও, সিরিয়ানদের প্রতিবাদ মার্কিন কর্তৃপক্ষ উপেক্ষাই করেছেন। তাছাড়া মিলিশিয়াদের অস্ত্র চোরাচালানের মার্কিনী অভিযোগও বিমান হানার যুক্তি হিসাবে ধোপে টেকে না।

ইউ টি ইউ সি উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ১২তম সম্মেলন

গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে ইউ টি ইউ সি উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ১২ তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। নৈহাটিতে মূলত ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের জুট মিল ইউনিয়নগুলির প্রতিনিধি, দমদম ক্যান্টনমেন্ট ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সংগঠনের রক্ত পতাকা উত্তোলন করেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড অশোক ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন ইউ টি ইউ সি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক কম. দীপক সাহা, অন্যতম সম্পাদক কম. সুবীর ভৌমিক, গণআন্দোলনের অন্যতম নেতা কম. মিহির পাল।

সম্মেলনের উদ্বোধন করতে গিয়ে কম. অশোক ঘোষ বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী মালিকতোষণকারী শ্রমআইন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। বর্তমান সরকারের ফ্যাসিবাদী পদক্ষেপ নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেন এবং সরকারের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণির সঙ্ঘবদ্ধ তীব্র আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন।

কম. সুবীর ভৌমিক শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলিকে বাজারিকরণ করা, সেই খাতে ব্যয়বরাদ্দ কমানো এবং সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলিকে চালানোর ক্ষেত্রে সরকারি অনীহার বিষয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। কম. দীপক সাহা রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন শ্রমিক বিরোধী নীতি ও কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা করেন, নতুন শ্রম আইনের বিভিন্ন শ্রমিক বিরোধী বিষয়গুলির উল্লেখ করে তার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার ডাক দেন।

সম্মেলনে প্রতিনিধিদের মধ্যে থেকে সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির পক্ষে আহ্বায়ক কম. মুজিবর রহমান কর্তৃক উত্থাপিত খসড়া রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করেন।

সম্মেলন থেকে মোট ১৯ জনের নতুন জেলা কমিটি তৈরি হয়। নতুন জেলা কমিটির সভাপতি কম. সুকুমার ঘোষ, কার্যকরী সভাপতি কম. কল্যাণ সেনগুপ্ত, সহ সভাপতি কম. সুধাংশু মণ্ডল ও কম. বিশ্বজিৎ দাস এবং সম্পাদক কম. মুজিবর রহমান ও সহ সম্পাদক কম. দীনেশ গুপ্তা নির্বাচিত হন।

আগামী ২৮ তারিখের ব্রিগেড সমাবেশকে ঐতিহাসিক সমাবেশে পরিণত করার শপথ নিয়ে সম্মেলনের কাজ শেষ হয়।

বামফ্রন্ট প্রার্থীদের নাম ঘোষণা

সংযুক্ত মোর্চার পক্ষ থেকে বামফ্রন্ট নেতা কমরেড বিমান বসু প্রথম দুই দফা নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য মনোনীত প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করলেন। ৫ মার্চ বিকাল ৪টায় একটি সাংবাদিক সম্মেলনে কম. বসু ৬০টি কেন্দ্রের প্রার্থীদের নাম জানিয়েছেন। এই সাংবাদিক সম্মেলনে জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা ও রাজ্যসভার সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য, বিধানসভা বিরোধী দলনেতা আব্দুল মান্নান। ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের সভাপতি সিমল সোরেন; সি পি আই (এম)-এর রাজ্য সম্পাদক কম. সূর্যকান্ত মিশ্র, সি পি আই নেতা কম. স্বপন ব্যানার্জী, ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা কম. নরেন চ্যাটার্জী এবং আর এস পি'র সাধারণ সম্পাদক কম. মনোজ ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন।

আর এস পি'র কম. ফাল্গুনী মুখার্জী বাঁকুড়া ছাতনা কেন্দ্র থেকে এবং কম. অনিল চন্দ্র মণ্ডল দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। জাতীয় কংগ্রেস এবং আই এস এফ-এর প্রার্থীদের কেন্দ্র নির্দিষ্ট রয়েছে। তাদের প্রার্থীদের নাম চূড়ান্ত হয়নি। ফলে কিছুদিন পরেই সেই নামগুলি জানানো হবে।

Vol. 68 Issue No. 28 শনিবার ৬ মার্চ ২০২১ আট
RN No. 2710/57 Rupees Two [By Air Rs. 2.10]
Phone : 2229-4653; e-mail : kranti.press@yahoo.com

গণবার্তা

বিহার নির্বাচন ও পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের কাজ

৫-এর পাতার পর

অর্থে, যেমন পশ্চিমবঙ্গে, রাজনৈতিক হিংসার কারণে সব ভোটই রক্তপাতময়-যুদ্ধ। ভোটে এমন নিয়মিত হিংসার ব্যবহার আর কোনো রাজ্যে এখন তেমন চোখে পড়ে না। সেটা স্কুল পরিচালনা সমিতির নির্বাচন হোক বা কলেজে ছাত্রপ্রতিনিধি নির্বাচন, পঞ্চায়েত, বিধানসভা বা লোকসভা নির্বাচন। সবই হিংসা ও রক্তপাতময় রাজনীতি। একচ্ছত্র ক্ষমতা দখলের প্রক্রিয়া বাংলার রাজনীতিতে জাঁকিয়ে বসেছে। বিহারেও এমন ছিল। ছিল পশ্চিমবঙ্গের চাইতেও অনেক বেশি। ভোট হতো বন্দুকের জোরে। গ্রামাঞ্চলে ছিল প্রত্যেক জাতের নিজস্ব সেনা। ভূমিহার ঠাকুরদের কুঁওর সেনা, যাদবদের যাদব সেনা, কুর্মিদের কুর্মী সেনা, রাজপুতদের রণবীর সেনা। নিম্নবর্গীয় ও দলিতদের সেনা না থাকলেও তাদের পাশে দাঁড়াত লালসেনা। ভোটের সময় এদের ভূমিকা ছিল ভোট বানচাল করার।

বিহারকে এই ধরনের নির্বাচনী হিংসা থেকে মুক্ত করার পেছনে নীতিশকুমারের সক্রিয় ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। যদিও সেই কৃতিত্বের রেশ আজ অনেকটাই তলানিতে এসে ঠেকেছে। ভয়ের জায়গায় নীতিশ কাজে লাগান লোভের আবেগ। যার নাম বিকাশ, সামাজিক ন্যায় ও স্বচ্ছ প্রশাসনের প্রতিশ্রুতি। এবং, তাতে নির্বাচনী সাফল্য পাওয়ায়, নির্বাচনের আগে ঢালাও প্রতিশ্রুতি বিতরণ প্রতিপক্ষ দলগুলি থেকে দেওয়াও দস্তুর হয়ে উঠেছে। বলপ্রয়োগ ও ভীতি প্রদর্শনের জায়গায় সেখানে চলে এসেছে আস্থা বা বিশ্বাসের প্রতিযোগিতা। ফলে, নির্বাচন প্রতিযোগিতাকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। তেজস্বী যাদব দশ লাখ চাকরি দেবেন বলেছেন, বিজেপি ১৫ লক্ষ চাকরি দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

আর, এর বিপরীতে, ভোটযুদ্ধ সেই রকম অবস্থা বা চরম মেরুকরণ, যেখানে একদল অন্যকে পরাস্ত নয়, রাজনৈতিকভাবে একেবারে খতম করে দেবার পথ ও প্রস্তুতি নেয়। তেমন স্বপ্ন দেখে। তেমন পরিস্থিতি তৈরি করে। সেখানে, বিজিত ও পরাস্তের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান তত্ত্বও রাজনৈতিকভাবে বাতিল করে দেয়া চলে। এই রাজ্যে ২০১১ সালে যেমনটা হয়েছিল। ত্রিপুরার বিগত নির্বাচনে যা ঘটেছে। জরুরি অবস্থা তুলে নেবার পরের ১৯৭৭ সালে লোকসভা নির্বাচনে যেমন ঘটেছিল। কিন্তু, লক্ষ করা যায় অধিকাংশ নির্বাচন প্রতিযোগিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। সেই কারণেই ভারতে নির্বাচনী গণতন্ত্র টিকে আছে। সব নির্বাচন ভোটযুদ্ধ হলে সেই দেশে গণতন্ত্র একেবারেই টেকে না। কংগ্রেসের মতো বিজেপিও কিন্তু বেশিরভাগ নির্বাচনে ভোট-প্রতিযোগিতার খেলাটাই খেলে গেল।

এবারের বিহারের বিধানসভা নির্বাচনকে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ''ফ্যাসিবাদী'' বিজেপি বিরোধী ভোটযুদ্ধে পরিণত করার প্রয়াস নিয়েছিলেন—বিহারের বিশেষত, বামপন্থীরা। তাদের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল দীপঙ্কর ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে সি পি আই এম এল লিবারেশন গোষ্ঠী, যারা মার্ক্সিস্ট-লেনিনিস্ট এর সংক্ষেপে মালে নাম বিহারে পরিচিত। রাষ্ট্রীয় জনতা দল ও কংগ্রেসের নেতৃত্বে মহাগঠবন্ধন নামের জোটে ভাকপা (ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, সিপিআই), মাকপা (মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি, সি পি আই এম) এবং মালে বামজোট হিসেবে সামিল হয়। আনুমানিক জনভিত্তির ওপর নির্ভর করে মালে ১৯টি আসনে মহাগঠবন্ধন প্রার্থী হিসেবে ভোট ময়দানে নামে, ভাকপা এবং মাকপা ৬ এবং ৪ আসনে। ভোটে মালে ১২টি আসনে আর ভাকপা ও মাকপা ২টি করে আসনে জয়লাভ করেছে। সব মিলিয়ে বামেরা জিতেছে ১৬টি আসনে। গত নির্বাচনে এদের মধ্যে কেবলমাত্র মালে তিনটি আসনে জিতেছিল।

বিহারের এই ২০২০র বিধানসভা নির্বাচন অনন্য হয়ে ওঠে অনেক কটি কারণেই। তার মধ্যে সর্বাগ্রে রাখতে হবে বিশ্বায়িত কোভিড মহামারী ও লকডাউনের অভিজ্ঞতা ও পরিস্থিতি। লকডাউন উঠলেও জনস্বাস্থ্যের সামাজিক ও দৈহিক দূরত্বের বিধিনিষেধ বজায় ছিল। ছিল বিহার থেকে ভিনরাজ্যে জনখাটতে যাওয়া শ্রমিকের কষ্ট করে, পায়ে হেঁটে, ঘরে ফেরার স্মৃতি। ভারতে প্রবাসী শ্রমিকদের মধ্যে বিহার রাজ্যের অধিবাসীদের প্রাধান্য সকলেই জানেন। তা ছাড়া, নীতিশকুমার দীর্ঘদিন ধরে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী। প্রতিযোগিতার ভোটে মসনদে দীর্ঘদিন টিকে থাকা যায় না। মানুষের ক্ষোভের আঁচ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে বাড়তে সীমা ছাড়ায়। মানুষ নতুন মুখ থেকে প্রতিশ্রুতি শুনতে চায়। টিকিয়ে রাখতে চায় আশা ও স্বপ্ন। নীতিশের সেটাই ছিল প্রধান বোঝা।

কিন্তু, ২০২০ সালের বিহার বিধানসভার ভোট এ সব সত্ত্বেও ভোটযুদ্ধে বদলায়নি, প্রতিযোগিতার ভোট হিসেবেই তা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাকে অনেকটাই নিশ্চিত করেছে বিহারের প্রশাসনিক সক্রিয়তা। নীতিশকুমারের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এই যে রাজ্য সরকারের প্রতি, আইনের প্রতি (অবশ্যই ভারতীয় মাপের) খানিকটা আস্থা তিনি টিকিয়ে রাখতে পেরেছেন। এই দায়িত্ব দিয়েই বিহারে সংঘপরিবার তাকে একদা স্থাপনা করেছিল। এখন যথা সময়ে ভারতীয় জনতা পার্টি বিহারে আড়াল থেকে সামনে আসছে। একে ভারতীয় জনতা পার্টির পরাজয়, বা সামান্য জয় বলে গণ্য করা হবে বাস্তবকে অস্বীকার করা। এই খেলাটা পশ্চিমবঙ্গেও সংঘপরিবার মমতা ব্যানার্জিকে নিয়ে খেলছে। যদিও, নীতিশ কুমারের মতো ''সুবোধ'' চরিত্রের নেতা মমতা নন। মমতার আশার কোনো সীমা পরিসীমা নেই। নীতিশ তাঁর এটাই শেষ মুখ্যমন্ত্রীত্ব বলে ঘোষণা করেছেন। মমতা অন্য ধাতুতে তৈরি। বাংলায় ভোট মহারণে পরিণত হবার পথেই চলেছে। যার নিয়মকানুন আলাদা।

আরেকটা কথাও বলা দরকার। বিহার নির্বাচনে মেরুকরণ হয়নি এটা বুঝবার জন্যে শুধু এনডিএ এবং মহাগঠবন্ধনের বাইরের ২৬ শতাংশ ভোটের হিসেব যথেষ্ট নয়। বিহারে ৫৭ শতাংশ ভোটার ভোট দিয়েছেন। মেরুকরণ সম্পূর্ণ হলে ভোটযুদ্ধে অন্তত আরও ২০ শতাংশ মানুষ ভোট দেয়। যা পশ্চিমবঙ্গে দেখা যায়। তা ছাড়া সাত লাখের বেশি ভোটার ভোটকেন্দ্রে এসে নোটায় বোতাম টিপেছেন। যার সামান্য অংশ ভোটের ফল চাইলে ওলটপালট করে দিতে পারত।

গরিব ও প্রান্তিক মানুষের ভরসা বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীরাই। তাদের কেবল অসাম্প্রদায়িক হলেই হবে না, পুঁজিবাদ বিরোধী হতে হবে। মেহনতিদের কাছে যেতে হবে শ্রেণিচ্যুত হয়ে। সমাজ পরিবর্তন হতে হবে তাদের সার্বক্ষণিক চিন্তা। এবং, নির্বাচনী প্রচারে তাদের পেশাদারিত্ব ও প্রযুক্তি দক্ষতা অর্জন করতে হবে। প্রচারের ফলাফল নিরন্তর মাপতে হবে, যা এখন যান্ত্রিক নিয়মে করা সম্ভব। পুঁজিবাদের ফ্যাসিবাদী চেহারা প্রযুক্তিনির্ভর হলেও—কোনো প্রযুক্তিই কিন্তু ফ্যাসিবাদী নয়। বামপন্থীদের ঘাটতি অনেক। তা পূরণ না করে, নিছক ইচ্ছাশক্তি দিয়ে জয়ের আশা বাস্তবসম্মত নয়।

ইউ এন ডি পি'র উন্নয়নের হিসেবে ভারতের অবনমন

জাতিসংঘের মানবিক উন্নয়ন সূচক অর্থাৎ ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং জীবনযাত্রার মানের সূচকের মাপকাঠিতে ২০২০ সালে আরও এক ধাপ অর্থাৎ ১৮৯ দেশের মধ্যে ১৩১তম স্থানে নেমে এসেছে মোদীর 'আত্মনির্ভর ভারত'। আর লাইফ এক্সপেকটেন্সী অর্থাৎ জন্ম থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত জীবনধারণের বয়স ২০১৯ সালে নেমেছে ৬৯.৭ বছর, যেখানে বাংলা দেশে সেই বেঁচে থাকার বয়স ৭২.৬ বছর। অবশ্য পাকিস্তানে সেই বয়স ভারতের থেকেও কম ৬৭.৩ বর।

উল্লেখযোগ্য যে নরওয়ে ইউ এন ডি পি'র উন্নয়নের মাত্রায় সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থিত। তার নীচে যথাক্রমে সুইৎজারল্যান্ড, হংকং এবং আইসল্যান্ড।

ইউ এন ডি পি'র মুখপাত্র শোকো নোডার এই তথ্যের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ২০১৮ সালে আন্তর্জাতিক ক্রয়ক্ষমতার তুল্যাঙ্ক অর্থাৎ পারচেজিং পাওয়ার প্যারিটির মাপকাঠি অনুযায়ী ভারতের জনগণের মাথাপিছু বার্ষিক আয় ছিল ৬৮২৯ ডরার, ২০১৯ সালে তা হ্রাস পেয়ে ৬৬৮১ ডলার।

ডাক্তার প্রবীর সেনগুপ্তের স্মরণসভা

বিগত শতাব্দীর ষাট সত্তর দশকে দীর্ঘ সময় যাবৎ আর এস পি'র সক্রিয় নেতা ও পরবর্তীকালে আজীবন দলের ঘনিষ্ঠ সহযোগী এবং শুভানুধ্যায়ী ডাক্তার প্রবীর কুমার সেনগুপ্ত গত ১১ ফেব্রুয়ারি প্রয়াত হয়েছেন। কৃতবিদ্যা চিকিৎসক হিসাবে তিনি অনেক বছর এস এস কে এম হাসপাতালে অতি যত্নের সঙ্গে অসুস্থ মানুষের চিকিৎসা করেছেন। অবসর পরবর্তীকালে ঢাকুরিয়া যাদবপুর অঞ্চলে বহু দুঃস্থ মানুষের পাশে থেকেছেন। ডা. প্রবীর সেনগুপ্ত (দীপক) অতি নিরভিমানী উচ্চ জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। তিনি দলের যুব সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়েছেন কৃতিত্বের সঙ্গে।গত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১১ ডা. প্রবীর সেনগুপ্তের পরিবারের সদস্যবৃন্দ এবং আর এস পি'র ঢাকুরিয়া আঞ্চলিক কমিটির যৌথ উদ্যোগে ঢাকুরিয়া যুবতীর্থে একটি স্মরণসভা আহূত হয়। সভায় পরিবারের সদস্যবৃন্দ এবং ঢাকুরিয়ার নাগরিকবৃন্দ সহ আর এস পি'র সাধারণ সম্পাদক কম. মনোজ ভট্টাচার্য, ইউ টি ইউ সি'র সাধারণ সম্পাদক কম. অশোক ঘোষ, কলকাতা জেলা কমিটির আর এস পি'র সম্পাদক কম. দেবাশিস মুখার্জী, নিখিল বঙ্গ মহিলা সংঘের রাজ্য সম্পাদিকা কম. সর্বানী ভট্টাচার্য, দলের ঢাকুরিয়ার আঞ্চলিক সম্পাদক কম. পুলক মৈত্র, কম. তাপস সেনগুপ্ত প্রমুখ উপস্থিত থেকে কম. প্রবীর সেনগুপ্তের সংগ্রামী সহজ সরল জীবনচর্যা এবং দলের প্রতি দায়বদ্ধতার বিষয়ে স্মৃতিচারণ করেন। ডা. সেনগুপ্তর প্রয়াণ দলের কাছে বিশেষ শোকের। আমরা তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

ডা. প্রবীর সেনগুপ্ত লাল সেলাম।

Printed and published by Manoj Bhattacharya from Kranti Press, 37 Ripon Street, Kolkata-700 016, Editor : Manoj Bhattacharya (Website : www.ganavarta.com) Price Rs. 2/-